ভে র রে

কংগ্রেস কারসাজি ... বিজেপির নীরবতা ... ২
আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও ৩
নয়া উদারবাদের সংকট ও ... চ্যালেঞ্জ ... ৪
হরিয়ানায় চাষীদের প্রতিরোধ ... ৫
'বাংলাদেশী' অতিকথা ও আসামের হিংসাত্মক ঘটনাবলী ... ৬
মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ১

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ১৯ সংখ্যা ৪০ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৮ নভেম্বর ২০১২

সিঙ্গুরের কায়দায় দুবরাজপুরে কৃষি ও গ্রামীণ জমি অধিগ্রহণে পুলিশের গুলি চালনার তীব্র নিন্দা ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

৮ নভেম্বর রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ

জনগণের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে; গুলি, টিয়ারগ্যাস ও লাঠি চালিয়ে বেঙ্গল এমটার হয়ে কৃষি জমি এবং গ্রামীণ জনগণের জমি অধিগ্রহণে গুলি চালালো তথাকথিত 'মা-মাটি-মানুষে'র সরকার। ২০০৭ সালে দুবরাজপুরে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের আন্দোলন এবং রাজ্যজুড়ে সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে কৃষি জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠেছিল তার ফলে এখানে এতদিন জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হয়নি। জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য জনশুনানী, গ্রাম সংসদের মতামত গ্রহণ বিশেষত ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন, বিকল্প বাসস্থান ও চাষের প্রশ্ন কোন কিছুর ফয়সালা না করে পুলিশ পাঠিয়ে মমতা ব্যানার্জী সরকারের জমি অধিগ্রহণের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা 'সিঙ্গুর-২' বলেই চিহ্নিত হবে। সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পক্ষ থেকে পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ৭ নভেম্বর দুবরাজপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, তার রিপোর্ট প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায়। পুলিশের সাহায্যে এইভাবে জমি আত্মসাৎ করা ও গুলি চালনার বিরুদ্ধে ৮ নভেম্বর সি পি আই (এম এল), পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতি ও কৃষিমজুর সমিতির নেতৃত্বে ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ সংগঠিত হবে।

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

(গত ৬ নভেম্বর সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে পেশ করা বক্তব্য)

আগামী ২৮-৩০ নভেম্বর হাওড়ার শরৎ সদনে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মূল আলোচ্য বিষয় ২-৬ এপ্রিল ২০১৩ রাঁচীতে অনুষ্ঠিত হতে চলা আসন্ন নবম কংগ্রেস। পার্টি কংগ্রেসের খসড়া দলিল নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। এবারে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও রাজনৈতিক লাইন ছাড়াও দেশজুড়ে আন্দোলনের যে ব্যাপক অ্যাজেণ্ডা দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সাধারণভাবে কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে আলোচনা হয়—আমরাও তা করব। কিন্তু এর পাশাপাশি নারী আন্দোলন, ছাত্র-যুব আন্দোলন এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে যা যা এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তা হল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে কর্পোরেট লুঠের হাত থেকে বাঁচানো ও সেই সম্পদের ওপর গণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, তার সাথে সাথে সংবাদমাধ্যম ও সংস্কৃতি—এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পার্টি কংগ্রেসে আলোচনা হবে। খসড়া দলিলে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদা প্রস্তাব থাকবে।

আমরা মনে করি কংগ্রেস ও বিজেপি এই দুই বড় পার্টির বিরুদ্ধে দেশে এক বিকল্প বামপন্থী শক্তি দরকার। একথা ঠিক যে সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষে প্রচুর আঞ্চলিক পার্টি উঠে এসেছে। কংগ্রেস টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে নতুন নতুন আঞ্চলিক পার্টি তৈরী হয়েছে—যেমন তৃণমূল কংগ্রেস তারা যতই নিজেদের সর্বভারতীয় বলে দাবি করুক, মূলত পশ্চিমবাংলা ভিত্তিক একটি আঞ্চলিক দল। একইভাবে অন্ধ্রে রাজশেখর রেড্ডীর ছেলে কংগ্রেস ভেঙ্গে একটি দল তৈরী করেছে। বিজেপিও একইভাবে ভাঙ্গছে। ঝাড়খণ্ডে বাবুলাল মারাণ্ডির একটা ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা আছে। কর্ণাটকে ইয়েদুরাপ্পার একটা নতুন কোন পার্টি তৈরীর সম্ভাবনা আছে। দেশজুড়ে কংগ্রেস-বিজেপি এবং পুরানো জনতা দল ভেঙ্গে আঞ্চলিক পার্টি গড়ে ওঠার একটা প্রবণতা গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে। এই আঞ্চলিক পার্টিগুলোকে গণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে তাদের সাথে ব্যাপক বোঝাপড়া গড়ে তোলার সুযোগ কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর আছে বলে আমরা মনে করি না। আঞ্চলিক পার্টিগুলোর রাজনৈতিক ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করে, বিশেষ করে তারা যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে সে রাজ্যেও তাদের আচরণ ও নীতি তাকে কষ্টিপাথরে বিশ্লেষণ করে তাদের সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টিকে নীতি নিতে হবে। আমাদের চোখে সমস্ত আঞ্চলিক পার্টি, কংগ্রেস ও বিজেপির নীতি অনুসরণ করছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা পার্টি কংগ্রেসে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং প্রস্তাব গ্রহণ করব।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশ থেকে ভ্রাতৃপ্রতীম পার্টির প্রতিনিধিরা যাতে পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত হতে পারে সে বিষয়ে আমাদের একটা চেষ্টা আছে। আমরা এর আগেও বিভিন্ন পার্টি কংগ্রেসেও তাদেরকে পেয়েছি। কিন্তু এবারের পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টি কংগ্রেস দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও সংহতির একটা মঞ্চ হয়ে উঠুক এটা আমরা চাই।

৯ নভেম্বর আমরা পাটনায় একটা বড় র‍্যালী করছি। গত ৪ তারিখে দুটি র‍্যালি—দিল্লীতে কংগ্রেস এবং পাটনাতে জনতা দল ইউনাইটেড সরকারি র‍্যালি হয়ে গেল। এর জবাবে জনগণের প্রশ্ন নিয়ে জনগণের র‍্যালি আমরা পাটনায় করছি। বিহারে বিশেষ করে আমরা অন্য বামপন্থী দল, জয়প্রকাশ ধারার যে সমস্ত কংগ্রেসী নেতা বিহারে এখনও আছেন তাদের র‍্যালীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। কংগ্রেস-লালু জোট এবং জে ডি (ইউ)-বিজেপি জোটের বিরুদ্ধে এবং বামপন্থী ও সমাজবাদী শক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করে এক তৃতীয় জোট গড়ে তোলার চেষ্টা আমাদের আছে। এই র‍্যালী একদিক থেকে তার সূত্রপাত ঘটাবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্তবর্তী কাটিহার জেলার কুডালাতে একটা পরমাণু চুল্লি গড়ে তোলার প্রস্তাব বিহার সরকার দিয়েছে। গোটা পূর্ব ভারতে এখনও কোন পরমাণু চুল্লী নেই। আমরা মনে করি পূর্ব ভারতে এই পরমাণু চুল্লীর কোন প্রয়োজন নেই। তাই আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি এবং এটা যাতে না হতে পারে তার জন্য এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে প্রচার করে ব্যাপক জনমত সংগঠিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছি।

পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আমরা জেলায় জেলায় কর্মী বৈঠক করছি এবং বিভিন্ন বামপন্থী শক্তির সাথে আলোচনা করছি। আমাদের কাছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ২/৩টি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। সাধারণভাবে সারা রাজ্যে, বিশেষ করে পঞ্চায়েতে গণতন্ত্রকে খর্ব করার একটা সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টাকে অবশ্যই আমাদের ব্যর্থ করে দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস এককালে সি পি এমের সন্ত্রাসের কথা বলত, সন্ত্রাস বিরোধিতার কথা বলত। উল্টো ছবিটা এখন পশ্চিমবাংলার বেশ কিছু জেলায় দেখা যাচ্ছে—তৃণমূলী সন্ত্রাস। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা বিরোধী প্রার্থী হবেন তারা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন কি না, সেখানে মানুষ ভোট দিতে পারবেন কিনা, এটা এক আশঙ্কা তৈরী হয়েছে। যতই সন্ত্রাস তৈরী করুন, তৃণমূল ফাঁকা ময়দান পেয়ে যাক তা আমরা চাই না। গোটা পশ্চিমবাংলায় এই মুহূর্তে গ্রামাঞ্চলে যে অবস্থাটা আছে—কৃষকের সংকট, গরিব মানুষের সংকট, ব্যাপক বেকারী, নরেগা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ, পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে মানুষের ক্ষোভ (গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫০ শতাংশ পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে চলে গিয়েছিল—যেখানে সি পি এমের পঞ্চায়েতের মতই দুর্নীতি চলেছে) আছে। এই বিক্ষোভকে প্রতিফলিত করার জন্য বা এটাকে সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এটাকে সম্ভব করার জন্য আমরা বামফ্রন্টের বাইরের বামপন্থী শক্তিদের সংহত করে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটা কার্যকরী, শক্তিশালী, ব্যাপক এক বাম জোট গড়ে তোলা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভকে রাজনৈতিক ভাষা দেওয়া আমাদের একটা লক্ষ্য থাকছে।

নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

৭ নভেম্বর, নভেম্বর বিপ্লব দিবসে, সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পক্ষ থেকে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

তৃণমূল সরকার কালিপূজোর কারণ দেখিয়ে ধর্মতলা অঞ্চলে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং এ ধরনের এক রবও ছড়িয়ে পড়েছিল যে লেনিন মূর্তিতে মাল্যদান কর্মসূচীকেও সরকার আটকে দেবে।

পার্টির পক্ষ থেকে কমরেডরা সকাল ১০টায় লেনিন মূর্তির সামনে উপস্থিত হন। অন্যান্য বাম পার্টির নেতা ও কর্মীরাও মূর্তিতে মালা দেওয়ার জন্য উপস্থিত হন। সম্ভবত আগে থাকতেই এই আঁচ করেই সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি।

এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লেনিন মূর্তিতে মালা দেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, কমরেড কল্যাণ গোস্বামী, এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষ থেকে কমরেড বাসুদেব বসু, কলকাতা জেলা পার্টির পক্ষ থেকে কমরেড দিবাকর ভট্টাচার্য, অফিস কার্যালয় সচিব সুরেশ মণ্ডল প্রমুখ।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

কংগ্রেস হাতের কারসাজি বিজেপির বধিরসুলভ নীরবতা

কংগ্রেস কা হাত, আম আদমী কে সাথ—এটাই ছিল ২০০৪ ও ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসী প্রচারের ক্যাচ লাইন। অবশ্য সকলেই জানেন যে কংগ্রেসের হাত সাধারণ মানুষের দুর্দশায় কোন সাহায্য করার কাজটিকেই বাদ দিয়ে অন্য অনেক কাজে ব্যস্ত থাকে। দেশের জামাই এই সাধারণ মানুষদের ব্যঙ্গ করে বলে 'ম্যাংগো আদমী'। আর সাধারণ মানুষদের জন্য মনমোহন সিং-এর রয়েছে শুধুই এক হুমকী—''টাকা গাছে ফলে না''। অথচ মনমোহন সিং ভালোই জানেন যে কংগ্রেসের হাত তার সামান্য কারসাজিতেই একবারে শূন্য থেকে টাকা আনতে পারে। টুজি ও কমনওয়েলথ্ গেমস থেকে কয়লা কেলেঙ্কারি পর্যন্ত সমস্তই হল কংগ্রেস হাতের মহান ইন্দ্রজালিক গুণের এক একটা নমুনা। এখন হাতের বহুমুখী ইন্দ্রজালিক গুণের আরও কিছু জানার প্রয়োজন হলে আমাদের রয়েছে বঢরা-ডি এল এফ-কংগ্রেস এই ত্রিকোণ সম্পর্কের যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ।

১৯৯৭ সালে যখন রবার্ট বঢরা ও প্রিয়াঙ্কার বিয়ে হয় তখন বঢরার ছিল পরিমিত আকারের এক পারিবারিক ব্যবসা—পিতল নির্মিত হ্যাণ্ডিক্রাফ্টের ব্যবসা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি ব্যাপকভাবে জমি ও সম্পত্তি দখল করে হোটেল থেকে জমিজমা ও তথ্যপ্রযুক্তি পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই তার ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন, ব্যবসাগুলোর নামও দেন চমৎকার—যেমন ''স্কাই লাইট'', ''ব্লু ব্রীজ'', ''রিয়েল আর্থ'' ইত্যাদি। বিগত ৪ বছরেই তিনি কম করে ৩১টি সম্পত্তি ও শত শত একর জমি কিনেছেন এবং এ সমস্ত কিছুই কেনা হয়েছে দিল্লী ও তার আশেপাশের এলাকায় এবং রাজস্থানের বিকানীর এর মতো ব্যবসায়ীক/ট্যুরিস্ট এলাকায়। বঢরা-র স্থাবর সম্পত্তি ও বিনিয়োগের ঘোষিত মূল্য ২০০৮ সালের মাত্র ৭.৯৫ কোটি থেকে লাফ দিয়ে ২০১০ সাল ৬০.৫৩ কোটি টাকায় পৌঁছে যায় এবং বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী তা হবে আরও কয়েকগুণ বেশি। উত্তরপ্রদেশে রবার্ট বঢরা-র হাস্যোজ্জ্বল মুখে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর সফল ব্যবসায়ী স্বামী তাঁর পেশার পরিবর্তন ঘটাতে আগ্রহী নন।

কিন্তু প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যা বলেননি তা এখন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও প্রশান্তভূষণের কল্যাণে সমগ্র দেশই জেনে গেছে। তা হল রবার্ট বঢরা-র ব্যবসায়ে 'সাফল্য'-এর পিছনের মুখ্য কারণ হল তার রাজনৈতিক যোগাযোগ। রবার্ট বঢরা যখন সরকার অধিগৃহীত এক ব্যাঙ্ক থেকে মোটা পরিমাণে ওভারড্রাফট পান, যখন ডি এল এফ-এর মতো দৈত্যাকার জমি ব্যবসায়ী তাঁকে বিনা শর্তে ৫০ কোটি টাকা ধার দেয় তখন তা এই কারণেই যে তিনি সোনিয়া গান্ধীর জামাই, আর সোনিয়া গান্ধী হলেন ইউ পি এ-র চেয়ারপার্সন। রবার্ট বঢরা নিছকই একজন 'ব্যক্তি' এবং বঢরা এবং ডি এল এফের চুক্তি ব্যক্তিগত স্তরে সম্পাদিত এক স্বচ্ছ লেনদেন বলে কংগ্রেস যে যুক্তি দিয়ে জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করে তা ডাহা ব্যর্থ হয়। বঢরা যদি নিছকই এক ব্যক্তি হতেন তাহলে কংগ্রেস কেন তাঁর পক্ষে নামার প্রয়োজন বোধ করল? চুক্তিটি যদি স্বচ্ছই হয়, তাহলে যিনি বঢরা-ডি এল এফ চুক্তি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই ন্যায়পরায়ণ আই এ এস অফিসার অশোক খেমকাকে কেন হুদা সরকারকে দিয়ে স্থানান্তরিত করা হল?

ডি এল এফের যে লাভ হয়েছে তা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু যে ডি এল এফ বাজার থেকে ধার করে থাকে, সে কেন বঢরাকে কোন সুদ ছাড়াই ধার দেবে (যাতে সুদ পাওয়া যায় ২.৫ কোটি টাকার মতো) এবং নিজের দামি সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করবে? দশকের পর দশক ধরে ধারাবাহিক বৃদ্ধি ও উদারনীতিবাদের যুগে হঠাৎই এক দর্শনীয় বৃদ্ধির পর ২০০৮ সালের ভেতরে ডি এল এফ এক দুর্দশার মধ্যে পড়ে যায়। রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে যে ডি এল এফ ধীরে ধীরে কিংফিশারের পথেই এগোচ্ছে। বঢরার সঙ্গে বোঝাপড়ার ফলেই ডি এল এফ জমি হাতাতে সক্ষম হয়। তা না হলে সিঙ্গুর-উত্তর পরিস্থিতিতে যেখানে কৃষি জমি রক্ষার জন্য জোরালো প্রতিরোধ গড়ে ওঠে সেখানে জমি হাতানো ডি এল এফের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার হত। বঢরা জেড প্লাস নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ 'আম আদমী'র মতো চলাফেরা করেন না। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে একই ধরনের ভি ভি আই পি খাতির পেয়ে থাকেন এবং এই রাজ্যগুলোতে এই 'সফল ব্যবসায়ী'র লোভাতুর খামখেয়ালীপনা মেটাতে প্রায়শই প্রচলিত নিয়মকানুনকে লঙ্ঘন করা হয়। এই লোভী ব্যবসায়ীর নজরে রয়েছে 'স্কাই লাইট' থেকে 'রিয়েল আর্থ' পর্যন্ত সমস্ত কিছুর ওপরেই।

বঢরা-ডি এল এফ চুক্তি এবং তার পরবর্তীতে সলমন খুরশিদ উপাখ্যান ইতিমধ্যেই গাড্ডায় পড়ে যাওয়া কংগ্রেসের আরও ক্ষতি ডেকে এনেছে। কিন্তু বিজেপি নিজেই এখন বহু প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে। কংগ্রেস-এন সি পি সরকারের দ্বারা সমস্ত নিয়মকে লঙ্ঘন করে নীতীন গড়কড়িকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্পর্কে কেজরিওয়াল যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমরা কিছু বলছি না। এই অভিযোগ অবশ্য বাকপটু গড়গড়িকে বাধ্য করছে নিজেকে এক 'সমাজ উদ্যোগী' হিসাবে অভিহিত করতে। বঢরা-ডি এল এফ চুক্তি নিয়ে বধিরসুলভ নীরবতায় বিজেপির দুর্নীতি বিরোধী ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বঢরা-ডি এল এফ চুক্তি নিয়ে প্রথম ২০১১ সালের মার্চ মাসে ইকনমিক টাইমস পত্রিকায় রিপোর্ট হয়। সেই সময় সুষমা স্বরাজ বলেছিলেন যে, এই সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য অরুণ জেটলিকে বলা হয়েছে। এখন প্রশান্ত ভূষণ ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে পরিমাণে ঘটনার উন্মোচন ঘটিয়েছেন জেটলি কি তা গত ১৮ মাসের মধ্যে করে উঠতে পারলেন না?

স্পষ্টতই, যে নরেন্দ্র মোদী সোনিয়া সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে থাকেন, তিনি সহ সমগ্র বিজেপি এ বিষয়ে চুপ করে থাকাটাই শ্রেয় মনে করেছে। কিন্তু কেন? এটা কি এই কারণে যে সোনিয়া গান্ধীর জন্মস্থান ইতালী, এর তুলনায় বঢরা যথেষ্টই ভারতীয়। বিজেপির ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব থাকাটা সম্ভবত বঢরার কারণে নয়, এটা সম্ভবত ডি এল এফ-এর জন্যই। ভারতের সবচেয়ে বড় ভূ-সম্পত্তির কারবারী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে বিজেপি নারাজ। ডি এল এফ কেবলমাত্র কংগ্রেস শাসিত রাজ্যেই কাজ করে না, গুজরাট সহ বিজেপি শাসিত রাজ্যেও কারবার করে। এ সমস্ত প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর ডি এল এফের শেয়ার মূল্যের পতন ঘটেছে এখনও পর্যন্ত বঢরা-র সেই ধরনের শেয়ার মূল্য নেই আর কংগ্রেস পার্টির শেয়ার মূল্য কত তা জানা যাবে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে যখন জনগণ ভোট দেবেন। তার ইঙ্গিত অবশ্য এখনই পাওয়া যাচ্ছে—উত্তরাখণ্ড মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র তেহরি উপনির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন এবং জঙ্গীপুর উপনির্বাচনে প্রণব মুখার্জীর পুত্রকে খুবই নগণ্য ব্যবধানে জিততে হয়েছে।

বিজেপি এই নীতিবাক্য মেনে চলছে যে, কাঁচের ঘরে বাস করে অন্যের ঘরে ঢিল ছোঁড়া যায় না। বিজেপির নিজের জন্যও আর এক বঢরা রয়েছে। জনগণ রঞ্জন ভট্টাচার্য (বাজপেয়ীর জামাই, পালিত কন্যার স্বামী)-এর কথা ভুলে যায়নি (এই সেদিন রাডিয়া টেপ ঘটনায় তার নাম উঠে এসেছিল) এবং আরও অনেকে বঢরা ও গড়করির সঙ্গে তুলনীয় 'খ্যাতি' অর্জন করেছে। কিন্তু বিজেপির সমস্যাটা আরও অনেক গভীরে রয়েছে। বিজেপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, কিন্তু তারা এই লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় কোন বৃহৎ ব্যবসায়ী ঘরানাকে বৈরী করে তুলতে বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না। এই কারণেই বিজেপি বোফর্স ধরনের পুরানো দুর্নীতির ঘটনায় লড়তে পারে, কিন্তু সেই ধরনের দুর্নীতির ঘটনায় লড়তে পারে না যেখানে ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের চক্র কাজ করছে। কংগ্রেস যতটা এই চক্রের প্রতিনিধিত্ব করে বিজেপিও সেই পরিমাণ এই চক্রেরই প্রতিনিধি ও তার নিজের জন্য এটা প্রয়োজনীয়ও বটে।

আজকের চ্যালেঞ্জ হল নিছকই রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা নয়, কেজরিওয়াল যেমন বলে থাকেন, বরং বৃহৎ ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের যোগসাজশের অর্থনীতি ও রাজনীতির ইতি ঘটানো এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করা। এইবারের লড়াইটা হবে শাসক পার্টি ও উদারনীতিবাদের জমানা উভয়কেই উল্টে দেওয়ার জন্য।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৩০ অক্টোবর ২০১২)

সম্পাদকীয়

সংস্কৃতির ওপর সুবেদারির কোপ

'তিন কন্যা' ছায়াছবিটির কলকাতার স্টার থিয়েটারে প্রদর্শনের সময়নির্দিষ্ট আগাম চুক্তি ছিল। তা সত্ত্বেও ছবিটির প্রদর্শন স্টার-এর এজেন্সী কর্তৃপক্ষের তরফে বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রকাশ্যে কারণ দেখানো হল, সময়-নির্ঘন্টের সুযোগ মিলছে না। কিন্তু চুক্তি করার পরে এসব টেকনিক্যাল 'যুক্তি' ধোপে টেঁকে না। স্টার কর্তৃপক্ষ যখন চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল তখন অস্বচ্ছতা ছিল না, কিন্তু ছবিটি ঠিক প্রদর্শনের মুখে এসে হঠাৎ অসুবিধার শিকার হয়ে গেল! স্টার-এর মূল মালিক কলকাতা পুরসভা। তবে এর ব্যবসায়িক বরাত দেওয়া হয়েছে এক বেসরকারি সংস্থাকে। এই অর্থে স্টার চলছে পিপিপি পলিসিতে। এখন ছবিটি দেখানো সম্ভব হচ্ছে না বলে জানাচ্ছেন যদিও ইজারাদার, তবে ধরা পড়তে বাকী থাকছে না নেপথ্যে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর ক্ষমতার চাপ। হলঘরটি মূলত থিয়েটারের জন্য হলেও সেখানে সিনেমা দেখানোও হয়, নিয়মরীতিতে আটকায় না। ঠিক যেমন, সামনে অনুষ্ঠিত হবে সরকারি চলচ্চিত্র উৎসব।

'তিন কন্যা' ছবির প্রদর্শন যে সরকারের চাপা বিষনজরের মুখে পড়ল তার আসল কারণটা হল, সরকার ভয় পেয়েছে ছবিটির চিত্রনাট্যে পার্ক স্ট্রীট ধর্ষণকাণ্ডের ছাপ থাকার তথ্য জানতে পেরে। তবে সেটা জানা সম্ভব হয়েছে সম্ভবত একেবারে শেষ সময়ে, তাই প্রদর্শনের দরজা বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে একেবারে শেষের দিকে এবং অকস্মাৎই। এই মনোভাব দেখিয়ে দেয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 'তিন কন্যা'র কথাকাহিনীর খবরাখবর যদি আরও আগে থাকতো তাহলে অন্যান্য হলঘরে প্রদর্শন হওয়া বানচাল করে দেওয়ার জন্য তো বটেই, এমনকি ছবিটির ছাড়পত্র পাওয়ার প্রশ্নেও হয়তো ক্ষমতার প্রতাপ খাটিয়ে হস্তক্ষেপ করতো। যাই হোক, সরকার আগে না পারলেও পরে আটকানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। কোনও সৌজন্যের তোয়াক্কা করে নি। সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা গোপনে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর অভিযোগকে উড়িয়ে দিতে অন্যান্য চিত্রগৃহে ছবিটি চলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু এটা হল একটা ধরা পড়ে যাওয়া দুরভিসন্ধিকে অস্বীকার করতে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার মতলব। সরকার সিদ্ধান্তটা ঘোষিতভাবে নেয়নি, নেওয়ার নৈতিক ও আইনগত অধিকারও নেই, তাই বাকী প্রদর্শিত হয়ে চলা সমস্ত হলঘরে খোলাখুলি ছবি বন্ধ করাতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। স্টার যেহেতু কলকাতা পুরসভার এ্যক্তিয়ারধীন, পুরসভার ক্ষমতায় রয়েছে যেহেতু তৃণমূল, যে এলাকায় রয়েছে স্টার সেখানকার কাউন্সিলরও তৃণমূলের; যে এজেন্সী মালিক স্টার চালানোর বরাত পেয়েছে তার তৃণমূলের সাথে আঁতাত থাকাটাও যেহেতু স্বাভাবিক, তাই ঐ চলচ্চিত্রশালায় অবরোধ খাড়া করা ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক, আর সেখানেই সেটা কার্যকরি করে মমতা সরকার তার বার্তা দিয়ে দিয়েছে।

এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ হল, পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় রঙের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র, চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয়নি। স্বঘোষিত 'পরিবর্তনের' ঠিকেদার সরকার একদিকে জমকালো চলচ্চিত্র উৎসব করছে, অন্যদিকে রুষ্ট হওয়া ছায়াছবির প্রদর্শন বন্ধ করছেন। তাদের সাংস্কৃতিক সহচর চক্র সব দেখে-বুঝেও অদ্ভুতভাবে নির্বিকার! ক্ষমতার মধুভান্ড কতই না 'পরিবর্তন' এনে দেয়! সংস্কৃতির ওপর সুবেদারির কোপ মারার এই প্রবণতা বিগত বামফ্রন্ট আমলেও বিস্তর ছিল। আজকের তৃণমূলী হুবহু প্রবণতার প্রকাশ নিয়ে তাই সি পি এম-এর হৈচৈ করার নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না। কংগ্রেসেরও পোড়ামুখে বড়মুখ করে গলাবাজী করার কিছু নেই। বিগত সত্তর দশকে 'আঁধি' ছায়াছবিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তদানীন্তন কংগ্রেসী জমানায় জরুরী অবস্থা জারীর কালে। তাই সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে তারপর বামফ্রন্ট আমল হয়ে বর্তমান তৃণমূল জমানায়।

প্রসঙ্গত এক বাজারী পত্রিকা বিশ্ব চরাচর থেকে ইতিহাসগত সাদৃশ্য তুলে ধরতে কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তালিন আমলের ও চীন দেশের কিছু নজীরকে টার্গেট করছে। তাদের উদ্দেশ্য হল, সংস্কৃতির উপর যা কিছু স্বৈরাচারি হস্তক্ষেপ চলে আসছে তার মতাদর্শগত-রাজনৈতিক উৎস হিসেবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে চিহ্নিত করা। এই পন্ডিতী ফলাতে দেখেও তৃণমূলের নেতা-নেত্রী, সাংস্কৃতিক জ্যাঠা-জেঠি-দাদা-দিদিরা পড়েছেন উভয়সংকটে। স্টার-এর ঘটনায় প্রবল প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়ে না করছেন অপরাধ স্বীকার, না পারছেন বাজারী সংবাদপত্র যেভাবে সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের আন্তর্জাতিক উদাহরণ তুলে ধরছেন তার সুরে সুর মেলাতে। কিন্তু বাজারী সংবাদপত্র যতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একপেশে আন্তর্জাতিক নজীর তুলে তোপ দেগে চলুক, তাদের সততা নেই ইতিহাসের এই নির্মম তথ্যকে এক ঘৃণ্য নজীর হিসেবে তুলে ধরার যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরী কালজয়ী চলচ্চিত্র 'ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন' নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছিল পুঁজিবাদের এক মক্কা-দেশ গ্রেট ব্রিটেনে।

রাইস মিল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি

পাণ্ডুয়ার বৈঁচী রাইস মিলের শ্রমিকেরা ম্যানেজমেন্টের ওপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করে গত ১ নভেম্বর নতুন মজুরি চুক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। মিলটির শ্রমিকদের একটি বড় অংশ ছিল সি পি এম প্রভাবিত। দু বছর অন্তর সি আই টি ইউ নেতারা এসে মালিকপক্ষের সাথে সমঝোতা করে এমনভাবে চুক্তিস্বাক্ষর করত যাতে শ্রমিকদের মজুরি খুব সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেত। সি পি এম ক্ষমতা হারানোর পর সি আই টি ইউ নেতারা

তিনের পাতার পর

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও বিপ্লবী বামদের করণীয় কর্তব্য

*(গত ৪ নভেম্বর পার্টির সাধারণ সম্পাদক **দীপঙ্কর ভট্টাচার্য** হুগলী ও বর্ধমান জেলার অগ্রণী কর্মীদের এক সভায় আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও বিপ্লবী বামেদের কর্তব্য বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর ভাষণ নিচে প্রকাশ করা হল।)*

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের দীর্ঘ একটানা শাসনের পর একটা নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত এই সরকার কোন পথে এগোতে চায়, জনগণের বিপুল প্রত্যাশার চাপ কীভাবে সামলাতে পারে, সরকার কতদিন স্থায়ী হবে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে মমতা ব্যানার্জীর ক্ষমতায় আসাটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ের মত। শাসকশ্রেণীর কাছে জনরোষে টালমাটাল বামফ্রন্টের একটা বুর্জোয়া বিকল্পের প্রয়োজন ছিল। সাবেক কংগ্রেসকে দিয়ে এই কাজটি করা যাচ্ছিল না। তাই কংগ্রেসের তথাকথিত ভদ্র, একমাত্রিক উপাদানের সঙ্গে আরও কিছু বিচিত্র, অতিরিক্ত উপাদান যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূলকে দিয়ে আপাতত সেই প্রয়োজন মেটানো গেছে।

সি পি এম গেল, টি এম সি এল। আমাদের অনেক কর্মী-সমর্থক প্রশ্ন করেন, আমরা কী পেলাম? উত্তর একটাই ঃ কিছু পাওয়া, না পাওয়া—সবটাই আমাদের উদ্যোগ, আমাদের কাজের ওপর নির্ভর করে। পরিস্থিতিটা এখন অনেক খোলা, অনেকটা উন্মুক্ত বা শিথিল। বামফ্রন্ট জমানার মত সেই আঁটো-সাঁটো ব্যাপারটা নেই। শ্রেণী সমন্বয়ের যে বাতাবরণটা গড়ে তোলা হয়েছিল সেটা নেই। শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্র ও সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে। তৃণমূল সামাজিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চাইলেও তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। শ্রেণী সংগ্রামের এই ক্ষেত্র ও সুযোগকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এই যে হিমঘর শ্রমিকদের মধ্যে কাজে আমাদের সাফল্য এল তার পিছনের শিক্ষাটা কী? সেখানে আমাদের চেষ্টা ছিল, শ্রমিকদের মধ্যেও ক্ষোভ ছিল—দুটির সংযোগ ঘটিয়েই সাফল্যলাভ সম্ভব হয়েছে। প্রচলিত রাজনীতির যে ধরণ, যে বাঁধাধরা প্যাটার্ণ তাকে পাল্টেই আমাদের অগ্রগতি ঘটতে পারে।

আমরা এ রাজ্যে বড় শক্তি নই—এটা তো জানা কথা। কাউকে নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে আমরা সংগঠন করি না। অতীতেও আমরা নিরাপত্তা দিতে পারিনি। আমরা মার খেয়ে পাল্টা মারও সেভাবে দিতে পারিনি। কিন্তু মার খেয়েও আমরা টিকে থেকেছি। আমরা আমাদের স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থান কখনও ত্যাগ করিনি। নিজেদের রাজনীতি ও আদর্শ নিয়ে আমরা টিকে থেকেছি। আজও আমাদের টিকে থাকতে হলে, সংগঠনের বিস্তার ঘটাতে হলে নতুন নতুন শক্তিকে আমাদের পক্ষে জয় করে আনতে হবে।

এ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে টি এম সি বা সি পি এম—কারও পক্ষেই কোন স্রোত বা হাওয়া বইছে না। সেই অর্থে এখানে একটা খোলা পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সি পি এম আগের তুলনায় কিছু উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করলেও তার ভগ্ন দশা এখনও কাটেনি। অন্যদিকে টি এম সি সরকারের প্রতি মানুষের বিরক্তি ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইউ পি এ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েও সেই ক্ষত মমতা মেরামত করতে পারছেন না। এ প্রশ্নে অবশ্য সি পি এমের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা একমত নই। সি পি এম বলছে, ইউ পি এ থেকে মমতা সমর্থন প্রত্যাহার করেছে আমেরিকার নির্দেশে। অদ্ভুত যুক্তি! সবেতেই আমেরিকার জুজু দেখে লাভ নেই। আমরা বরং বলছি এটা মমতার বিলম্বিত বোধোদয়। তবে জনগণের কাছে আরও বড় বিবেচ্য হল ঃ রাজ্য সরকারে থেকে মমতা ব্যানার্জী কী করছেন? মানুষ গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণকে ঘিরে প্রশ্ন তুলছেন। গণআন্দোলনের কর্মীদের গ্রেপ্তার, মিটিং-মিছিলে নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে। এই প্রতিবাদের আবহে আমাদের শ্লোগান হল ঃ পঞ্চায়েতে গণতন্ত্র খর্ব করার চক্রান্তকে রুখে দিতে হবে। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, জনগণের পয়সা নয়-ছয় করা চলবে না। আমরা চাই গ্রামের উন্নয়ন। জনগণের অধিকারকেই আমরা সবার ওপরে স্থান দিতে চাই। আমাদের তাই জনগণের সংগ্রামের মঞ্চ হিসেবে পঞ্চায়েতকে গড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, পঞ্চায়েতের রাজনীতি নিছক গ্রামের রাজনীতি, নীচুতলার (গ্রাস রুট) রাজনীতি নয়। সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচন মুক্ত হতে পারে না। সর্বভারতীয় পটভূমিতেই এই নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।

কংগ্রেসের সম্পর্কে জনগণের বিশাল ক্ষোভ আবার বিজেপির পক্ষেও হাওয়া নেই। এই অবস্থায় তৃতীয় ফ্রন্টের কথা বলে সি পি এম অতীতে এ রাজ্য থেকে ফায়দা তুলেছে। এখন কিন্তু সে আর তৃতীয় ফ্রন্ট নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করছে না। আসলে মাথায় তার ঘুরছে 'প্রথম ফ্রন্টে'র কথা। কংগ্রেসের প্রতি আজ যে তার নরম মনোভাব তা থেকে সে শেষমেষ যে কংগ্রেসের সঙ্গেই মিত্রতা করতে চায় তারই আভাষ পাওয়া যায়। এইভাবেই তার মতাদর্শগত দেউলিয়াপনা স্পষ্টতর হচ্ছে। কেরলে আগেই সে বামফ্রন্টের বদলে এল ডি এফ গঠন করেছে। পশ্চিমবাংলায়ও সে বামফ্রন্টের ধারণাকে শিকেয় তুলে রেখে এখন 'নির্দল'দের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমাদের কাছে ভোট মানে শুধু সরকার পরিবর্তন নয়। ইউ পি এ জোট এবং এন ডি এ জোট উভয়েরই বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে জনগণ সরকারের নীতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইছেন। গোটা ব্যবস্থাটারই পরিবর্তন ঘটানোর মত বিপ্লবী পরিস্থিতি এখনও সৃষ্টি হয়নি কিন্তু আমাদের অবশ্যই সরকারের নীতি পরিবর্তনের জন্য জনগণের আকাঙ্খাকে বুঝে নিতে হবে। জাতীয় স্তরে দুর্নীতি বিরোধিতার নামে অন্য একটা রাজনীতি আমদানির চেষ্টা চলছে। কেজরিওয়ালরা ব্যবসায়ী-রাজনীতি আঁতাতের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলছেন তার মধ্য দিয়ে একটা সুর খুব স্পষ্ট। তাদের দাবি ঃ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রাজনৈতিক দল যে তহবিল সংগ্রহ করবে তার হিসাব প্রকাশ্যে জানিয়ে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে আসলে ব্যবসায়ী-রাজনীতির আঁতাতকে আইনসিদ্ধ করার ওকালতি করা হচ্ছে।

কোলগেট দুর্নীতি নিয়েও কংগ্রেস-বিজেপি উভয়েই যেভাবে জড়িয়ে পড়েছে সেখান থেকে এক বুর্জোয়া সমাধান হিসেবে কয়লাক্ষেত্রের ওপর যেটুকু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অবশিষ্ট আছে তাও তুলে নিয়ে পুরোটাই বেসরকারিকরণের সুপারিশ করা হচ্ছে। ১৯৭৩-এ কয়লা খনির জাতীয়করণ হয়। ১৯৭৬-এ ব্যক্তি মালিকদের শিল্পে ব্যবহারের জন্য ক্যাপটিভ খনির অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৯৯৩-তে এসে শুধু নিজেদের শিল্পের জন্য নয়, বাজারে ব্যবসার জন্যও কয়লাখনি বেসরকারি মালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তখনই কোলগেট কেলেঙ্কারির উৎস তৈরী হয়। এখন সকলেই জড়িয়ে যাওয়ায় কোন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণই না রাখার শয়তানি পরিকল্পনা ফাঁদা হচ্ছে।

আমাদের কাছে তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইটা বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। উদারিকরণের নীতি প্রত্যাহারের সংগ্রামের অধীনে রেখেই আমাদের দুর্নীতি বিরোধী সংগ্রাম চালাতে হবে।

এই রাজনৈতিক স্পষ্টতা নিয়ে আমাদের বামপন্থার পুনর্বিন্যাস, পুনর্জাগরণের জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে হবে। বিনা যুদ্ধে আমরা তৃণমূলকে মাটি ছেড়ে দেব না। আমাদের দেখতে হবে যেন জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভাষা পায়, যেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে। বাম আন্দোলনের পুনর্জাগরণের জন্য আমাদের মনের প্রসারতা দেখাতে হবে। ছোট ছোট যে সব বামপন্থী শক্তি আছে (অবশ্যই সি পি এমকে বাদ দিয়ে) তাদের সাথে ঐক্য গড়ে তোলায় আমাদের দ্বিধা করলে চলবে না। নিচুতলায় কোথাও কোথাও সি পি এমের কর্মী ও স্থানীয় নেতারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইবে। তাদের সাথে সংগ্রামী সম্পর্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ওপর থেকে, রাজ্য দপ্তরে বসে সবকিছু নির্ধারণ করা যায় না। নিচুতলায়, জমিতে দাঁড়িয়ে যুক্তমোর্চা গড়ে উঠুক। কিন্তু আমাদের নিজেদের ব্যাপক পরিধিতে সম্ভাব্য সর্বাধিক আসনে প্রার্থী দিতে হবে। সি পি এম ভাঙ্গবেই, সি পি এম ছেড়ে যারা আমাদের ব্যানারে দাঁড়াতে চাইবেন তাদের আমরা স্বাগত জানাবো। সি পি এম কংগ্রেসের হাত ধরে শক্তি বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে। আমরা কোনমতেই সি পি এমের হাত ধরে নয়, নিজেদের স্বাধীন উদ্যোগের ওপর ভর করেই এগিয়ে যাব।

হুগলী-বর্ধমানে শুধু কিছু আসন জেতাটা আমাদের লক্ষ্য হতে পারে না। বেশ কিছু জায়গায় পুরো পঞ্চায়েতই দখল করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এবার পশ্চিমবঙ্গে ৫০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হচ্ছে। সারা দেশে আমরাই প্রথম মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি তুলেছিলাম। এখন যোগ্য মহিলা প্রার্থী দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তুতির অভাব আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে নিশ্চয় সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। এই কারণে নানাস্তরে মহিলাদের সমাবেশিত করা ও তাদের রাজনীতিকরণের কাজটিতে আমাদের খুবই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

হুগলী জেলায় গ্রামীণ ক্ষেতমজুর ধর্মঘটকে সফল করে তুলতে গণকনভেনশন

ক্ষেতমজুরদের জন্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম ১৭১ টাকা মজুরির দাবিতে আগামী ১০ নভেম্বর হুগলী জেলা জুড়ে গ্রামীণ ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির হুগলী জেলা কমিটি। জেলাজুড়ে অতীতের অভিজ্ঞতাতেও দেখা গেছে ধনী কৃষকদের সাথে রফা করে ক্ষেতমজুরদের ৫-১০ টাকা মজুরি বাড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে যখনই সি পি আই (এম এল)-এর নেতৃত্বে ক্ষেতমজুরদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত করে মজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে তখন গ্রামীণ কুলাকরা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চাষীদের পার্টির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে বিভিন্নভাবে। শাসকশ্রেণীর যে দলগুলো কেন্দ্রের সরকারে বসে থেকে সার-বীজের ওপর থেকে ক্রমাগত ভর্তুকি ছাঁটাই করে কৃষকদের সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের তরফে 'চাষীদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু' আসলে ক্ষেতমজুরদের এই স্বাধীন শ্রেণী আত্মঘোষণাকে দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই। এর বিরুদ্ধে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকের ধাপে ধাপে যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠছে সেই দিশায় আরও ব্যাপকতর জনমত গড়ে তুলতে সি পি আই (এম এল)-এর পোলবা-দাদপুর-ধনিয়াখালি এরিয়া কমিটির পরিকল্পনায় একটি 'গণকনভেনশন' গত ৩ নভেম্বর পোলবা-দাদপুর ব্লকের পুইনান বেসিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হল। কনভেনশনে প্রায় ১৫০ জন কৃষিমজুর-গরিব কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশন থেকে একটি প্রস্তুতি কমিটি গড়ে তোলা হয়। যার আহ্বায়ক হল পার্টির এরিয়া কমিটির সদস্য ও যুব নেতা সজল দে। তিনি কনভেনশনের প্রস্তাবনা পেশ করার পর অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় কনভেনশন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কৃষিমজুর সমিতির জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন বাগ, পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির জেলা সম্পাদক শুভাশীষ চ্যাটার্জী ও পার্টির পোলবা-দাদপুর-ধনিয়াখালি এরিয়া কমিটির সম্পাদক ও পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য সজল অধিকারী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পেশ করা প্রস্তাবনা ও বক্তাদের সকলের কথাতেই যে মৌলিক সুরটি ভেসে আসে তা হল দেশব্যাপী কৃষি সঙ্কটের এই বোঝা সব থেকে বেশী চাপছে কৃষিমজুরদের ওপর। সরকার আইন বানাচ্ছে কৃষি কাজে নিয়োজিত মজুরদের ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে, অথচ দিনের পর দিন কৃষিতে ভর্তুকি কমিয়ে আনছে, কৃষকদের কাছ থেকে লাভজনক সহায়ক মূল্যে ফসল কিনছে না, চাষীরা বাধ্য হচ্ছে অভাবী বিক্রীতে।

কনভেনশনের সর্বশেষ বক্তা সজল অধিকারীর ভাষণের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন ''সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। হরেক রকমের ধনী কুলাকদের রাজনৈতিক শক্তি গ্রামীণ এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে চাইবে গ্রামীণ সর্বহারার এই শ্রেণী ঐক্যকে ভাঙতে। যে গ্রামগুলোতে শক্তিশালী সংগ্রামী শ্রেণী ঐক্য গড়ে উঠেছে সেই গ্রামগুলোতে সফলভাবে ১০ নভেম্বর ধর্মঘট সংগঠিত করার সাথে সাথেই বড় আকারে প্রচার সংগঠিত করতে হবে।

কনভেনশনটি পরিচালনা করেন পার্টির ধনিয়াখালি লোকাল কমিটির সদস্য ও যুব নেতা অমিয় দাস। ৩ নভেম্বর কনভেনশনে আশপাশের গ্রামগুলো থেকে আসা কমরেডরা এক উদ্দীপনাময় পরিবেশে ধনী কৃষকদের ছলচাতুরির পাল্টা একগুচ্ছ জবাব সূত্রবদ্ধ করে ফিরে যান তাদের গ্রামগুলোতে ১০ নভেম্বর ক্ষেতখামার স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে।

- দীপঙ্কর সেনগুপ্ত

... শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি

দুয়ের পাতার পর

একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে যায়। মূল্যবৃদ্ধির চাপে জেরবার শ্রমিকেরা উপযুক্ত মজুরি আদায়ের জন্য নিজেরা উদ্যোগ নিতে শুরু করেন। সি পি আই (এম এল) কর্মীরা তাঁদের সাহস যোগাতে থাকেন এবং মিলের সমস্ত শ্রমিক একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের দাবি সনদ প্রস্তুত করেন। কিছু টালবাহানার পর ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। নতুন চুক্তি অনুযায়ী মিলের মহিলা শ্রমিকদের দৈনিক ২৫ টাকা মজুরি বৃদ্ধি ঘটে। মহিলা শ্রমিকরা ধান মেলা ও শুকনো করার কাজে যুক্ত। এই কাজের জন্য পূর্বে তাঁরা দৈনিক মজুরি পেতেন ৪০ টাকা ও দু কেজি চাল। নতুন মজুরি চুক্তির ফলে তাঁরা পাবেন দৈনিক ৬৫ টাকা ও দু কেজি চাল। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ফায়ারম্যানরা মাসে ৩০০ টাকা বেশী বেতন পাবেন। পূর্বে তাঁদের মাসিক বেতন ছিল ২২০০ টাকা+৩০ কিলো চাল। এখন তাঁরা পাবেন মাসিক ২৫০০ টাকা+৩০ কিলো চাল। সি পি আই (এম এল)-কে পাশে পেয়ে শ্রমিকরা চুক্তির মেয়াদকেও দু বছরের পরিবর্তে এক বছরে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

নয়া উদারবাদের সংকট ও গণআন্দোলনের সামনে চ্যালেঞ্জ

*(এই বিষয়ে ইংরাজিতে **অরিন্দম সেন**-এর লেখা একটি পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদকগুলী, দেশব্রতী)*

মুখবন্ধ

কয়েক বছর আগে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ল এবং দ্রুতই তা এক মহামন্দায় রূপান্তরিত হল, আমরা তখন ''সংকটে পুঁজিবাদ ঃ কারণ, তাৎপর্য ও সর্বহারা প্রত্যুত্তর'' নামে একটা ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলাম। ঐ পুস্তিকার শুরুর লাইনগুলো ছিল এইরকম ঃ ''পুঁজিবাদ সংকটকে সঙ্গে নিয়ে এবং সংকটের মধ্যে দিয়েই বাঁচার অভ্যাস অর্জন করেছে; তবে কিছু সংকট যুগান্তকারী। যেমন ১৯৩০-এর মহামন্দা। যে সংকট এবার নিজেকে মেলে ধরছে সেটাও কি ঐ ধরনের আর একটা সংকট বলে প্রমাণিত হবে?'' সেরকম হবে বলেই আমরা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম এবং প্রবীণ নোবেল জয়ী পল স্যামুয়েলসনের এই মন্তব্যকে উদ্ধৃত করেছিলাম ''পুঁজিবাদের কাছে এই বিপর্যয় কমিউনিজমের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মতনই।'' তবে বিভিন্ন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে, যথা ২০০০ সালের গোড়ার দিকের ডটকম বুদবুদের ফেটে যাওয়া, যেগুলো বিশ্বস্তরে ব্যবস্থাগত সংকটের জন্ম দেওয়ার ইঙ্গিত দিলেও পরিশেষে তা ঘটেনি, আমরা শুরুর সেই সময়ে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত টানার প্রলোভনকে সংবরণ করেছিলাম।

গত চার বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা কিন্তু এখন বলতে পারি ঃ হ্যাঁ এটা অবশ্যই যুগান্তকারী সংকট এবং তা এই দিক থেকে যে, বর্তমান নয়া উদারবাদী ধারায় পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের কাঠামো ও কৌশলগুলো সংকটে নিমজ্জিত, ১৯৮০-র দশক থেকে যেভাবে তা ফল দিয়ে আসছিল, এখন ধারাবাহিকভাবেই তা ব্যর্থ হয়ে চলেছে। আমরা এটাকে তাই আরও নির্দিষ্টভাবে বলছি *নয়া উদারবাদের সংকট* এবং সেই অনুযায়ী আমাদের বিশ্লেষণের পরিসরকেও বিস্তৃত করেছি। তা করতে গিয়ে আমরা মার্কস ও লেনিন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের মার্কসবাদীদের এবং তার সঙ্গে প্রথাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের বাইরে গিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁদের রচনার ওপরও যথেষ্ট মাত্রায় ভর করেছি।

আগের পুস্তিকাটিতে যেখানে প্রকাশমান সংকট থেকে জন্ম নেওয়া জনগণের সংগ্রামকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছিল, বর্তমান পুস্তিকাটিতে আমরা এই বিষয়টাকে শেখার চেষ্টা করেছি যে, শ্রেণী সংগ্রামের গতিসূত্র প্রতিটি কাঠামোগত সংকটের পরিণতিতে উদ্ভুত সংস্কার বা পুনর্বিন্যাসের সুনির্দিষ্ট ধারাকে কিভাবে চূড়ান্তমাত্রায় প্রভাবিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩০-এর দশকের উদ্দীপনাময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম কিভাবে বুর্জোয়াদের নয়া বন্দোবস্ত (নিউ ডিল) গ্রহণে বাধ্য করেছিল, আর কিভাবে এক বিপরীত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে ধাক্কা ১৯৭০-এর কাঠামোগত সংকটের পরিণতিতে নয়া উদারবাদী ''কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস''-এর পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিল।

আমরা মনে করেছি, বর্তমান সংকটের শ্রেণীগত মাত্রা, রাজনৈতিক তাৎপর্য ও সম্ভাব্য পরিণতিকে বোঝবার জন্য ঐ ধরনের পর্যালোচনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে—যে উপলব্ধি ছাড়া আমরা বিশ্বের ৯৯ শতাংশরা ১ শতাংশের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ''সংকটটাকে আঁকড়ে ধরতে'' (সমীর আমিন যেমন বলেছেন) পারব না।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে লগ্নি পুঁজির আধিপত্যের পরিস্থিতিতে মুমূর্ষু একচেটিয়া পুঁজিবাদরূপে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন আর এই যুগের অভিজ্ঞতা বাণিজ্য চক্র ও পুঁজিবাদী সংকট সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ব্যাখ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ করেছে। আমরা আশা করি, এর আগে শুরু করা আলোচনাকে আরও সমসাময়িক ও বিস্তৃত করে তোলা বর্তমান পুস্তিকাটি কর্মীবৃন্দ ও পর্যবেক্ষকদের অর্থনৈতিক সংকট ও তার রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভে সাহায্য করবে।

দৈত্যদের পতন ও তার পরবর্তী পর্যায়

২০০৮-এর ১৮ সেপ্টেম্বর। মার্কিন অর্থ সচিব বেন বার্ণানকে বিষণ্ণ মুখে আইন প্রণেতাদের বললেন, সরকার যদি (আর্থিক) বাজারগুলোকে না বাঁচায় তবে ভবিষ্যতে হয়ত কোন আর্থিক বাজারই আর থাকবে না।

তিনি সত্যি কথাটাই বলেছিলেন। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে বন্ধকি কারবারে নিযুক্ত ১০০টিরও বেশি সংস্থা দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। লগ্নিকারবারি ব্যাঙ্ক বিয়ার স্টার্নস-এরও পতন ঘটতে চলেছে এই আশঙ্কায় তার পতন ঠেকাতে জলের দামে ঐ সংস্থা জে পি মর্গান চেজের দ্বারা অধিগৃহীত হল। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে আর্থিক সংকট চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছাল। বেশ কিছু বড় সংস্থা হয় দেউলিয়া হয়ে পড়ল, অথবা জোরজবরদস্তি অধিগৃহীত হল বা সরকার সেগুলোকে অধিগ্রহণ করল। এই সংস্থাগুলোর মধ্যে ছিল লেম্যান ব্রাদার্স, মেরিল লিঞ্চ, ফ্যানি মে, ফ্রেডি ম্যাক, ওয়াশিংটন মিউচুয়াল, ওয়াচোভিয়া, সিটি গ্রুপ এবং এ আই জি ইনসিওরেন্স—এতদিন যে সংস্থাগুলোকে ''এত বড় যে দেউলিয়া হয়ে পড়তে পারে না'' বলে মনে করা হয়েছিল। অতএব, ''২০০৮-এর জরুরী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলকরণ আইন'' পাশ করানো হল, যা বিপন্ন সম্পদ ত্রাণ কর্মসূচীর (টি এ আর পি) মাধ্যমে ওয়ালস্ট্রীটের ধনকুবেরদের উদ্ধারে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের বিপুলাকায় অর্থ অনুমোদন করল।

এর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিরোধিতা দেখা গেল—যার মধ্যে দুজন নোবেল জয়ী সহ ৪০০ অর্থনীতিবিদ ছিলেন। এই বিরোধিতার মূল বিষয়টা এই ছিল যে, বিপর্যয়ের জন্য দায়ী বেসরকারি লগ্নিকারিদের শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং এইভাবে ভবিষ্যতের জন্য এক খারাপ দৃষ্টান্ত, এক ''নৈতিক ঝুঁকি''-র সৃষ্টি করা হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঙ্ক মালিকদের সরকার এতে কোন কর্ণপাতই করল না।

সংকট যখন বৈদ্যুতিন গতিতে অন্যান্য ধনী দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল (সংকট আসলে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল ঃ ২০০৭-এর আগস্টে ফরাসি দৈত্য বি এন পি পরিবাস ''নগদ অর্থ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হওয়া''র কারণ দেখিয়ে তিনটি হেজ ফাণ্ড থেকে অর্থ তোলাকে বন্ধ করে দিয়েছিল), ঐ দেশগুলোও তখন নিজ নিজ উদ্ধার প্যাকেজ নামাল।

এইভাবে, সরকারগুলো করদাতাদের অর্থে লগ্নিকারবারের সংস্থাগুলোকে উদ্ধার করায়[১] সম্পূর্ণ ধসকে এড়ানো গিয়েছিল এবং মোটামুটি দু-বছরের মধ্যে দুর্বল, খুঁড়িয়ে এগোনো পুনরুদ্ধারের পর্যায় শুরু হল।

এ সত্ত্বেও, এই লেখা যখন চলছে তখন পুঁজির নাছোড় সংকট বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়েছে, তা নতুন নতুন দিককে সামনে আনছে, নতুন নতুন বিতর্কের ও সংগ্রামের জন্ম দিচ্ছে—কিছুটা পরে আমরা যেগুলোকে আলোচনা করব।

কিন্তু কিভাবে পরিস্থিতি এরকম হয়ে উঠল?

খুব সোজা ভাবে বললে, লেম্যান ব্রাদার্স, এ আই জি ইনসিওরেন্স, ফ্যানি মে আর ফ্রেডি ম্যাক-এর মত অতিকায় সংস্থাগুলো (শেষোক্ত দুটি সরকার পরিচালিত সংস্থা) দেউলিয়া হয়ে পড়ল, কেননা সেগুলো তাদের স্বল্পমেয়াদী ঋণের দায় সামলানোর জন্যে দরকারের সময় বাজার থেকে অর্থ তুলতে পারেনি। ২০০৪ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক নির্বিচারে তাদের আর্থিক কারবারের বিস্তার ঘটায়—২০০৭ আর্থিক বর্ষে তাদের ঋণের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৪.১ ট্রিলিয়ন ডলারে যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০৭-এর জি ডি পি বা মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩০ শতাংশ—যা আর্থিক ধাক্কার পরিস্থিতিতে তাদের বিপন্নতাকে বাড়িয়ে তোলে।

সাব-প্রাইম বন্ধকী বাজারের সঙ্গে বিপুলভাবে জড়িত হওয়ায় এবং ডেরিভেটিভের ওপর চরম নির্ভরশীল হওয়ায়—অন্যান্য সম্পদ থেকে আহরিত লগ্নিপত্রকে সাধারণভাবে ''ডেরিভেটিভ বলে—তারা বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি হয় এবং বাজার তাদের ওপর আস্থা হারায়। এইসব সম্ভ্রান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ ধার দিতেও লগ্নিকারীরা অনীহা দেখায়। ঋণ শোধে অক্ষম হওয়ায় তারা বস্তুত দেউলিয়া হয়ে পড়ে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে (লেম্যান অবশ্য এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম) সরকার তাদের উদ্ধার করে।

''সাবপ্রাইম বন্ধকী বাজার'' বা ''সাবপ্রাইম ঋণ'' বলতে মূলত বোঝায়, এমন লোকেদের আবাসন ঋণ দেওয়া যাদের সেগুলো নেওয়ার মত সঙ্গতি নেই এবং যেখানে শুরুর দিকে সুদের হার হবে সাবপ্রাইম (অত্যন্ত কম)। কিন্তু ক্রমশই তা বাড়তে থাকবে, যেহেতু ধরে নেওয়া হয় যে ঋণ গ্রহীতার কর্মজীবন যত এগোবে ততই তার কিস্তি শোধ করার সামর্থ্য বাড়তে থাকবে। সাবপ্রাইম ঋণপত্রগুলোকে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য অন্যান্য ঋণপত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে নতুন ডেরিভেটিভ তৈরি করা হয়। প্রথম বন্ধকী প্রতিষ্ঠানগুলো সেই ডেরিভেটিভকে অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিক্রি করে দিত।

এইভাবে এক ছায়া ব্যাঙ্কব্যবস্থা জন্ম নিল। ধরে নেওয়া হল যে, সাবপ্রাইম ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ঋণকে মিশিয়ে উদ্ভুত ডেরিভেটিভগুলো বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তারা সক্ষম হবে। ফলে প্রত্যেকের ভাগে ঝুঁকি কম পড়বে।

এই কৌশলের ফলে লগ্নিকারীরা নিয়ন্ত্রণকে এড়িয়ে যেতে এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাজি ধরে ও ঝুঁকিকে অন্যের ঘাড়ে পাচার করে সহজে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারল। আবাসন বুদবুদের ফেটে যাওয়া এবং বিপুল সংখ্যক সাবপ্রাইম ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ বাকি পড়ে যাওয়ার ফলে ঐ 'বাজিগুলো' ওলটপালট' হয়ে গেল। ফলে চুক্তিগুলোকে নিয়ে তৈরি হওয়া গোটা পিরামিডটাই ধসে পড়তে লাগল। ২০০৭ ও ২০০৮-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের সরকারগুলো সংকট-জর্জরিত ব্যাঙ্ক ও কিছুটা কম মাত্রায় ঋণগ্রস্ত বাড়ির মালিকদের সাহায্য দিয়ে একাধিকবার বিপর্যয়কে আটকানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোন ফল হল না। গোটা প্রক্রিয়াটার সংকট তীব্রতর হয়ে উঠে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে এক বিপর্যয়ের আকার নিল।

এখন এটা বিস্ময়কর মনে হলেও, অতি মাত্রায় সাবপ্রাইম ঋণ এবং লগ্নিপত্র তথা ডেরিভেটিভ সৃষ্টির অন্তহীন জালকে নিয়ে চরম ঝুঁকির ঐ কৌশলকে কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করেনি। এই কৌশলকে বরং কর্পোরেশন এবং দেশ উভয়ের পক্ষেই সমৃদ্ধির সুনিশ্চিত পথ বলে প্রশংসা করা হয়েছিল। ২০০৫ সালের জন্য তার বাৎসরিক পুরস্কার—যেটা হল সিকিউরিটি শিল্পের সবথেকে মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কারগুলোর অন্যতম—ঘোষণা করতে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিং রিভিউ বলে, ''(লেম্যান ব্রাদার্স) বাজারে তার সার্বিক উপস্থিতিকেই শুধু বজায় রাখেনি, নতুন নতুন প্রোডাক্টের বিকাশ ঘটিয়ে এবং লেনদেনগুলোকে ঋণকারীদের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত উপযুক্ত করে তুলে ... অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাঙ্খিত স্থানটি দখল করেছে। লেম্যান ব্রাদার্স হল সবথেকে বেশি উদ্ভাবনক্ষম, এমন সমস্ত কাজ সে করছে যেগুলো অন্য কোথাও দেখা যাবে না।''

ঠিকই, লেম্যান অত্যন্ত বেশি চালাক হয়ে উঠেছিল আর সে কারণেই তার ঐ পরিণতি। বিধ্বংসী ভূকম্পনের উৎসস্থল যেহেতু লগ্নি ক্ষেত্রের মধ্যে অর্থাৎ ঋণের অন্তহীন জালের মধ্যেই রয়েছে, সংকটের কারণগুলোর অনুসন্ধানকে আমাদের তাই এখান থেকেই শুরু করতে হবে।

আশু কারণ ঃ ঋণ ব্যবস্থার মাত্রাধিক বিস্তার ও চরম ফাটকাবাজি

একটা সময়ে পুঁজির—ঋণের কারবারি বা লগ্নিকারীর—ভূমিকা ছিল মূলত শিল্প ও বাণিজ্যের ''চাকাগুলোকে সচল রাখা'' যেগুলো বাস্তব কিছু সামগ্রি, পরিকাঠামো ও পরিষেবা উৎপন্ন করত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাদের ভূমিকার সম্প্রসারণ ঘটে এবং আজ আমরা তাদের দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে দেখছি ঃ **বৃদ্ধির** গতিকে ত্বরান্বিত করা ও সংকটের অগ্রদূত হয়ে ওঠা, এই উভয় ভূমিকাতেই। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা এটাকে সম্যকরূপে প্রতিপন্ন করে।

১৯৭০-এর দশকে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার মোকাবিলার কৌশল হিসাবে আমেরিকার শ্রমজীবী জনতাকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থার জোরদার সম্প্রসারণ, নতুন ও অপরিণামদর্শী বন্ধকী ব্যবস্থা ও অন্যান্য উপায়ে তাদের ভোগের স্তরকে বজায় রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এই পন্থার একটা রাজনৈতিক সুবিধাও ছিল। তা হল ঋণের শৃঙ্খলে সর্বহারাকে বশীভূত ও নিষ্ক্রিয় করে রাখা।

অনেক দিন আগেই লেনিন ''সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রে ভাঙ্গন'' রচনায় দেখিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা উপনিবেশগুলো থেকে অর্জিত অতি মুনাফার একটা ছোটো ভাগ এই শ্রমিকদের একটা অংশকে উৎকোচ হিসাবে দিয়ে, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে তাদের বেশি মজুরি দিয়ে নিজেদের দেশে তারা অভিজাত শ্রমিকদের একটা স্তর বানানোর কৌশল গ্রহণ করেছিল। এখন তারা মজুরিকে কমিয়ে রেখে বিপুল পরিমাণে ঋণ দিচ্ছে এবং এইভাবে শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে মজুরি দাসত্বের এক আধুনিক সংস্করণ আর তার সঙ্গে ভোগবাদের মতাদর্শগত দাসত্ব।[২] ''আমেরিকার জীবনধারা'' সমস্ত ধরনের উপভোগ সামগ্রীর অত্যাধিক চাহিদাকে সুনিশ্চিত করে আর মার্কিন অর্থনীতিও চলতি ও আর্থিক খাতে বিপুল ঘাটতি নিয়ে, অর্থাৎ ধার করা অর্থের সাহায্যে সচল থাকে।

২০০০ সালে ''ডটকম'' বা ''নয়া অর্থনীতি''র শেয়ার বুদবুদ যখন ফেটে গেল, মার্কিন অর্থনীতি মন্দার মধ্যে চলে গেল। ৯/১১-র আক্রমণ সেটাকে গভীরতর করে তুলল। আর্থিক পতনের আতঙ্ককে প্রশমিত করতে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বল্প মেয়াদি ঋণে সুদের হারকে কমিয়ে আনল। এ সত্ত্বেও ২০০৩-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কর্মসংকোচন হতেই থাকল, আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও স্বল্প-মেয়াদি ঋণে সুদের হারকে কমিয়ে চলল। ২০০২-এর অক্টোবরে শুরু হয়ে পুরো তিন বছর আমেরিকার ঋণের প্রকৃত (অর্থাৎ, মুদ্রাস্ফীতিকে হিসেবে নিয়ে) হার বাস্তবে ঋণাত্মকই ছিল। ফলে ব্যাঙ্কগুলো অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে থাকল। সেগুলো আবার ধার দিল আর মুদ্রাস্ফীতিকে হিসেবে নিলে, তারা যা শোধ করল তা আসলে গৃহীত ঋণের চেয়ে কম। ''সস্তা অর্থ, সহজ ঋণ''-এর কৌশল এক নতুন বুদবুদ-এর সৃষ্টি করল—এবার আবাসন

পাঁচের পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে
চাষীদের প্রতিরোধ

কুরুক্ষেত্রে আরও একটা ''কুরুক্ষেত্র'' ঘটে গেল। গত ১৮ অক্টোবর, হরিয়ানা কুরুক্ষেত্রে শয়ে শয়ে চাষীর তুমুল বিক্ষোভের মুখে বন্ধ হয়ে গেল মনসেন্টোর ভুট্টা বীজ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ।

হরিয়ানা সরকার পরিচালিত কুরুক্ষেত্রে চৌধুরী চরণ সিং হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের খোলা মাঠে মার্কিন বহুজাতিক বীজ কোম্পানী মনসেন্টো কীট প্রতিরোধক ভুট্টা বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল। বেশ কয়েক মাস যাবত সরকারি গবেষণা কেন্দ্রে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাটির এই পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছিল। ১৮ অক্টোবর, শয়ে শয়ে চাষী ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন (বি কে ইউ)-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে উল্লিখিত গবেষণা কেন্দ্রটি ঘিরে ফেলে অবিলম্বে ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধের দাবিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গ্রামবাসীদের কাছে খবর যায় যে, মনসেন্টোর লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসাজশ করে খোলা মাঠে চালানো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জীন রূপান্তরিত বীজটি গবেষণা কেন্দ্রে গোপনে এনে আরও কিছু পরীক্ষা চালাবে। ঐ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা ব্যাপক সংখ্যায় জড়ো হতে শুরু করেন। তাঁদের সংগঠিত বিক্ষোভের মুখে গবেষণা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, শাহবাদের কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টারের উপস্থিতিতে পরীক্ষালব্ধ তথ্য সম্বলিত মূল কাগজপত্র প্রকাশ্যে নষ্ট করে ফেলা হয়। জীন রূপান্তরিত ভুট্টার একটাও দানা যাতে গবেষণাগারে প্রবেশ করতে না পারে সেটাও সুনিশ্চিত করতে বাধ্য হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এর আগে, হরিয়ানা সরকার জীন রূপান্তরিত (জি এম) ভুট্টা দানার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার অনুমতি দিয়েছিল মনসেন্টো, পাইওনিয়ার, সিনজেন্টা এবং ডাও এগ্রো সাইন্সের মত বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ঐ বছরের আগস্ট মাসে, কৃষি সংক্রান্ত ৩২ সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় স্ট্যাণ্ডিং কমিটি সংসদে তাদের তথ্যসম্বলিত রিপোর্ট পেশ করে ''যে কোন অছিলায়, বা ছদ্মবেশের আড়ালে'' ''খোলা মাঠে'' দেশের যে কোন প্রান্তে জি এম বীজের যে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে তাদের স্পষ্ট সুপারিশ করেছিল আর, দীপেন্দ্র হুড়া (হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুড়ার পুত্র) ছিলেন ঐ সংসদীয় কমিটির একজন সদস্য, যিনি সর্বসম্মত ঐ সুপারিশে স্বাক্ষর করেছিলেন।

ইতিমধ্যে সুপ্রীম কোর্টের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটি সারা দেশে, সর্বত্র, বিটি খাদ্য শস্য, জীন রূপান্তরিত বীজ বা শস্যের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর ১০ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করেছে। দেশের আণবিক জীববিদ্যা ও জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে উক্ত কমিটি এই সুপারিশ করেছে। এই কমিটি সুপারিশ করার সময় রিপোর্টে জানিয়েছে যে, জীন রূপান্তরিত ঐ সমস্ত বীজ, শস্য বা ফসল শুধু মানব শরীরের পক্ষেই বিপজ্জনক নয়, তা গবাদি পশু, জীববৈচিত্র্যকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতি করবে। আর প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে, খোলা মাঠে বা ক্ষেতে ঐ সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালে তা দারুণভাবে প্রভাবিত করবে নিয়মিত শস্য উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহকেও। সুপ্রীম কোর্টের এই কমিটি আরও উদ্বেগের সঙ্গে জানিয়েছে যে, জীন রূপান্তরিত শস্য কতটা নিরাপদ তা বিচার করার মত কোন সংস্থা বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা বর্তমানে আমাদের দেশে নেই। এমনকি খোলা মাঠে বা ক্ষেতে এনিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কেও সম্যক ধারণা আজও এ দেশে গড়ে ওঠেনি।

চৌধুরী চরণ সিং হরিয়ানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত এক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ গবেষক ডাঃ রামকুমার বলেছেন, ''এই সমস্ত জীন-রূপান্তরিত শস্য থেকে ক্যান্সার, জন্মগত কিছু দোষ, মহিলাদের হরমোন নিঃস্বরণে অস্বাভাবিকতা প্রভৃতি নানা ব্যাধি সাম্প্রতিকালে দেখা যাচ্ছে।''

দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং সংসদ থেকে জি এম বীজ সম্পর্কে বর্ণিত সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও হরিয়ানার কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার ঐ সমস্ত বিপজ্জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর অনুমতি খিড়কি দরজা দিয়ে করে দিচ্ছে।

দুবছর আগে দেশজোড়া প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিটি বেগুনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তার পরেও কংগ্রেস শাসিত একটি রাজ্য বহুজাতিক সংস্থার ঐ নিষিদ্ধ বীজটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ঢালাও সরকারি ব্যবস্থাপনা তৈরি করে দিচ্ছে।

একসময়ে, দেশের নীতিকাররা তুলা চাষিদের বিটি তুলা সম্পর্কে অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছিল। ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নতমানের তুলা চাষ, কীটমুক্ত ফসলের উচ্চগ্রামে সরকারি ঢক্কানিনাদের মাঝখানে বিটি তুলা চাষ শুরু হয়। কিন্তু আজ সরকারিভাবে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে সেই স্বপ্নের প্রকল্পটির করুণ গর্ভপাত ঘটেছে। প্রায় এক দশক আগে জীন রূপান্তরিত বিটি তুলার চাষ শুরু হয় যা মোটামুটি ৯০ শতাংশ তুলা চাষি ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথম পাঁচ বছর টেনেটুনে ঐ 'সাফল্যের' কাহিনী বিজ্ঞাপিত করার পর তার করুণ পরিণতি সামনে এল। উৎপাদনে পড়ল রীতিমতো ভাঁটা, আর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি কীট (বলওয়ার্ম) প্রতিরোধে সক্ষম হলেও অন্যান্য নানান কীটপতঙ্গের আক্রমণের মুখে দেখা গেল বিটি তুলা সম্পূর্ণ অরক্ষিত, প্রতিরোধহীন। তুলা চাষকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যাপক পরিমাণে অন্যান্য কীটনাশক জরুরী হয়ে পড়ল, যা কিনতে চাষিরা ক্রমেক্রমেই ঋণ-জর্জর হয়ে পড়লেন তুলা চাষের খরচ যে হারে বাড়তে লাগল, ফেরত সে তুলনায় হল নিতান্তই কম। ঋণের ফাঁদে অসংখ্য কৃষক শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন আত্মহত্যার মর্মান্তিক রাস্তা। দেশের ৯ তুলা উৎপাদনকারী রাজ্যের মধ্যে মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি তুলা চাষিদের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। মহারাষ্ট্রের তুলা উৎপাদনকারী বিদর্ভ অঞ্চলের ৬টি জেলায় সরকারি হিসাবে ২০১১ সালে ২০৯ জন চাষি আত্মহত্যা করেন ''কৃষি সংক্রান্ত কারণের জন্য''। এই প্রথম, এ বছর ৯ জানুয়ারী, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের তরফ থেকে তুলা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলোর জন্য এক সরকারি নোটে তুলা চাষিদের আত্মহত্যার নেপথ্যে বিটি তুলাকেই দায়ী করা হয়। তাবে বলা হয়, ''বিটি তুলা চাষ শুরু করার পর থেকে তুলা চাষিরা গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। বিটি তুলা চাষিদের মধ্যেই বিশেষভাবে আত্মহত্যার ঘটনা অনেক বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।''

স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্যের ওপর চরম নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করা সত্ত্বেও কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলো ঐ সমস্ত বহুজাতিক বীজ কোম্পানীগুলোকে আমাদের দেশে অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র বানাবার মওকা করে দিচ্ছে। এইভাবে বিপন্ন হচ্ছে দেশের স্বকীয় বীজ ক্ষেত্র, খাদ্য শস্য। তার বিরুদ্ধে বারংবার বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। পিছু হটেছে সরকার। কিন্তু চুপিসাড়ে, খিড়কি দরজা দিয়ে মনসেন্টোর মত দৈত্যকে ফের অনুপ্রবেশের রাস্তা করে দিচ্ছে কিছু রাজ্য সরকার। এর বিরুদ্ধে হরিয়ানার চাষিদের কুরুক্ষেত্রের ''যুদ্ধ'' অবশ্যই প্রশংসার দাবি জানায়। সর্বস্তরের মানুষকে নিয়েই এই বহুজাতিক হামলার বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।

- অতনু চক্রবর্তী

নয়া উদারবাদের সংকট ... ও চ্যালেঞ্জ

চারের পাতার পর

বন্ধকের ওপর ভিত্তি করে। এই ''বিরাট বুদবুদ হস্তান্তর''-এর সঙ্গে জড়িত হল উপভোক্তা ঋণের আরও সম্প্রসারণ এবং আর্থিক ক্ষেত্রে মুনাফার বিপুল বিস্ফোরণ, যা সম্ভব হল ক্রমেই বেশি বেশি ঝুঁকি সম্পন্ন ঋণ গ্রহীতাদের যুক্ত করে বন্ধকী আর্থিক কারবারের সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে। এইভাবে মন্দাকে তখনকার মত আটকানো গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে তীব্রতর রূপে তার আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তোলা হয়েছিল।

মার্কসের রচনা থেকে উদ্ধৃত নিচের অনুচ্ছেদটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, অর্থনৈতিক বিপর্যয় কেন ঋণ ও অর্থের সংকটের রূপে শুরু হল। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা বন্ধনীর মধ্যে আমাদের কিছু মন্তব্য যোগ করেছি।

''যে উৎপাদন ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক নিরবচ্ছিন্নতা ঋণের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে ঋণপ্রাপ্তি সহসা বন্ধ হয়ে নগদে লেনদেনই একমাত্র স্বীকার্য হয়ে উঠলে লেনদেনের মাধ্যমের (অর্থ) জন্য উন্মত্ত হুড়োহুড়ি আকারে একটা সংকট দেখা দিতে বাধ্য। **প্রথম দৃষ্টিতে গোটা সংকটটাকেই তাই ঋণ ও অর্থের সংকট বলে মনে হয়**। আর বাস্তবিক পক্ষে এটা হুণ্ডিগুলোকে (এখানে এখনকার ঋণপত্রগুলোকে যোগ করে নিন) অর্থে রূপান্তরিত করার প্রশ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এই হুণ্ডিগুলোর অধিকাংশই প্রকৃত ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেগুলোর প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্প্রসারণই হল গোটা সংকটটার ভিত্তি। অপরদিকে, **হুণ্ডিগুলোর একটা বড় অংশই নির্ভেজাল প্রতারণার হাতিয়ার যেগুলো এখন উদঘাটিত হয় এবং পুরোপুরি ধসে যায়**। এছাড়াও কিছু হুণ্ডি যা অন্য লোকের মূলধন তা অসফল ফাটকাবাজিতে লাগানো হয়। সবশেষে, কিছু হুণ্ডি এমন পণ্যমূলধন যার অবচয় ঘটেছে বা সম্পূর্ণ অবিক্রয়যোগ্য হয়ে উঠেছে, অথবা অপ্রত্যাশিত আয় যেটাকে আর কখনই অর্জন করা যাবে না, এসবেরও প্রতিনিধিত্ব করে। **পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার জোরজবরদস্তি সম্প্রসারণের গোটা কৃত্রিম ব্যবস্থাটার প্রতিকার সম্ভব নয়** ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের মত (আজকে আমরা সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের কথা বলতাম) **কোন ব্যাঙ্ককে দিয়ে তার কাগজের ভিত্তিতে সমস্ত প্রতারকগুলোকে তাদের পুঁজির ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়ানো এবং সমস্ত অবচয়িত পণ্যগুলোকে তাদের পুরনো মূল্যে কেনানোর মাধ্যমে সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত, এখানে সবকিছুই বিকৃতরূপে হাজির হয়, কেননা কাজসর্বস্ব এই জগতে প্রকৃত মূল্য ও তার প্রকৃত ভিত্তি কোথাও প্রকাশ পায় না।** ...'' (পুঁজি, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-৪৯০ বড় হরফ আমাদের)

মার্কস আরও বলেছেন, ''এক নয়া আর্থিক অভিজাততন্ত্র, প্রমোটারদের রূপে এক নতুন ধরনের পরগাছা, ফাটকাবাজি এমনকি নামকাওয়াস্তে ডিরেক্টর; কোম্পানী শুরু করা, বাজারে শেয়ার ছাড়া ও শেয়ার নিয়ে ফাটকাবাজি''র কথা। তিনি আরও বলেছেন ''অলীক পুঁজি, সুদ-অর্জনকারী কাগজ''-এর কথা যেগুলোর মূল্য ''সংকটের সময় ব্যাপকহারে কমে যায় এবং তার সঙ্গেই হ্রাস পায় সেগুলো দিয়ে তার মালিকদের বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার সামর্থ্য।'' (পুঁজি, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-৪৯৩)। এটা যদি একেবারে সমসাময়িক বলে শোনায় তবে একইরকম শোনাবে আজকের দিনের বিশেষজ্ঞ কমিটি ও আর্থিক কর্তৃপক্ষের পূর্বসূরী ১৫০ বছর আগের ''ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক কমিটি''র এই বক্তব্য ঃ ''**ব্যাপকভাবে অলীক ঋণের সৃষ্টি করা হয়েছে**'' বিলগুলো ডিসকাউন্ট ও রিডিসকাউন্ট করে ''**লণ্ডন বাজারে বিলগুলোর গুণাগুণ বিচার না করে শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক ঋণের ভিত্তিতেই**।'' (পুঁজি, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ-৪৯৭, বড় হরফ আমাদের)।

মূল্যহীন ঋণপত্র অতএব এখনকার ওয়াল স্ট্রীটের কারবারীদের কোন উদ্ভাবনা নয়!

(চলবে)

১। চীনও প্রায় ৬০০ বিলিয়ন ডলারের *অর্থনৈতিক উজ্জীবন* প্যাকেজ ঘোষণা করে (যেটা লোলুপ ব্যাঙ্ক মালিকদের *উদ্ধার প্যাকেজ থেকে* সম্পূর্ণ আলাদা) যাতে জোর দেওয়া হয় অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের ওপর।

২। সংকট শুরুর সাথে সাথে সমস্ত স্তরের জনগণই শোষণের নতুন পন্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠছেন। ডেভিড গ্রেবার সম্প্রতি যেমন দেখিয়েছেন, ''অকুপাই আন্দোলনের ব্যাপক সংখ্যকই কোনও-না-কোনও ভাবে ছিল আমেরিকার ঋণ ব্যবস্থা সৃষ্ট উদ্বাস্তু। অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলনের বিস্তার আমাদের ব্যবস্থার স্বরূপকে বুঝে ওঠার সূচনা ঘটাতে সাহায্য করেছে ঃ এটা হল ঋণকে নিংড়ানোর এক বিপুলাকায় ইঞ্জিন। ঋণের মধ্যে দিয়েই ধনীরা আমাদের অবশিষ্ট জনগণের কাছ থেকে সম্পদ শুষে নেয়, দেশে ও বিদেশে।

অকুপাই আন্দোলন যথাযথভাবেই সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরার প্রলোভনকে সংরবণ করেছে। আজ যদি আমাকে একটা দাবি নির্দিষ্ট করতে বলা হয়, তবে সেটা হবে যতটা বেশি মাত্রায় সম্ভব ঋণকে বাতিল করা। ...'' (*ঋণ কি বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে?* ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২, রচনাটি তাঁর ওয়েবসাইটে দেখা যেতে পারে।)

বিহারের সাহারে কমরেড রাম নরেশ রামের মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষে বিরাট জনসভা

গত ২৬ অক্টোবর কমরেড রাম নরেশ রামের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে বিহারের সাহারে শোন নদীর তীরে তাঁর মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষে হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে সি পি আই (এম এল) সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। মূর্তি উন্মোচনের আগে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কমরেড সিদ্ধিনাথ রাম।

কমরেড রাম নরেশ রামের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সি পি আই (এম এল) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড স্বদেশ ভট্টাচার্য, কার্তিক পাল, এন মূর্তি, রামযতন শর্মা, রামজী রাই, অমর, নন্দকিশোর প্রসাদ; কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য কে ডি যাদব, বি বি পান্ডে, সরোজ চৌবে, কুণাল এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কমরেড দীপঙ্কর ভট্টচার্য বলেন, যখন ভারতের সমাজ বিপ্লবের ইতিহাস লেখা হবে তখন কমরেড রাম নরেশ রামের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁর যে মূর্তি স্থাপন হল শোন নদীর তীরে তা কেবলমাত্র বিহারের ও ভোজপুরের জনগণকে নয়, সারা ভারতের অত্যাচারিত জনতাকে তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে তুলবে। তিনি আরও বলেন, যখন ভোজপুর সামন্ত দুর্গ হিসেবে পরিচিত হোত, যে সময়ে গরিবদের কোনও স্বীকৃতি ছিল না, সেসময়ে কমরেড রাম নরেশ রাম সামন্ত আধিপত্যকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করেছিলেন, প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গরিবদের মর্যাদার অধিকার ও পরিচিতিকে, আর এইসব করার মধ্য দিয়ে ভোজপুর তথা সারা বিহারের পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছেন।

ঐ সভায় সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির সভাপতি কমরেড রামেশ্বর প্রসাদ সহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশের বিশালতা আরও একবার দেখিয়ে দিল কমরেড রাম নরেশ রাম হলেন বিহারের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনগণের জননায়ক। তাঁর মূর্তি উন্মোচন কর্মসূচীতে উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণ কুমার নির্মোহী। মূর্তি নির্মাণ করেন ভাস্কর মনোজ পঙ্কজ। সভা থেকে দাবি গৃহীত হয়, শোন নদীর ওপর আরোয়াল থেকে সাহার যে সেতুটি রয়েছে সেটি রাম নরেশ রামের নামে নামাঙ্কিত করা হোক। এই কারণেও এই দাবিটি আরও যুক্তিসঙ্গত যেহেতু কমরেড রাম নরেশ রাম রাজ্য বিধানসভায় থাকাকালীন সেতুটি নির্মাণের ব্যাপারে লাগাতারভাবে সরব ছিলেন।

‘বাংলাদেশী’ অতিকথা এবং আসামের হিংসাত্মক ঘটনাবলী

(আসামের কোকরাঝাড়ে বোড়ো-মুসলিম দাঙ্গার পর থেকে শুরু হয়েছে একের পর এক আশঙ্কা। গুজব, হিংসাত্মক ঘটনা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণের দেশের বিভিন্ন শহর ছেড়ে যাওয়ার পালা। একদিকে চলেছে কোকরাঝাড়ের সংঘর্ষের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশেষতাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার এবং তার পরিবর্তে উত্তর-পূর্ব থেকে আসা সকলকে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চালনাকারি হিসেবে চিহ্নিত করার দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারাভিযান। আর অন্যদিকে, বিজেপি এবং আর এস এস-এর তরফে উদ্দেশ্যমূলক ও সংগঠিত সাম্প্রদায়িক প্রচারাভিযান, যাতে সমস্ত সংঘর্ষের জন্য বাংলাদেশ থেকে আসা বেআইনী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের দায়ী করা হচ্ছে। অন্যথায়, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সবচেয়ে তীব্র বিরোধী এবং বিদ্রোহ দমনের নামে এ এফ এস পি এ এবং দানবীয় সামরিকবাদের কট্টর জাতিবাদি সমর্থক বিজেপি এই ঘটনা থেকে সাম্প্রদায়িক পুঁজি হাসিল করার উদ্দেশ্যে নিজেকে উত্তর-পূর্বের রক্ষাকর্তা হিসাবে নিজেকে জাহির করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নিলিম দত্তের আসামে ‘বাংলাদেশি অভিবাসন’-এর অতিকথাকে উদঘাটিত করার উদ্যোগে লেখাটি থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল—‘‘লিবারেশন’’ সম্পাদকীয় নোট)

আসামের কোকরাঝাড় জেলায় সম্প্রতি সংঘটিত দাঙ্গা শুরু হয় জুলাই ২০১২-তে, যা পার্শ্ববর্তী বোড়ো আঞ্চলিক পরিষদের জেলাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল, প্রধানত বোড়ো জনগণ এবং বাইরে থেকে আসা এই জেলাগুলোতে বসতি স্থাপনকারি মুসলিম জনগণের মধ্যে ঘটেছিল, তা আরও একবার সেই কূটতর্কের অবতারণা করে যে এ সমস্ত কিছুর কারণ হল বাংলাদেশ থেকে অবাধ বেআইনী অনুপ্রবেশ, যা এবার এমনকি লোকসভার কক্ষেও অনুরণিত হয়।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন মুম্বাইয়ে ‘‘আসামের মুসলিমদের ওপর আক্রমণ’’-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত ‘‘প্রতিবাদ’’ দাঙ্গায় পরিণত হয়ে যায়, অথবা এর বদলা হিসাবে ভারতের অন্যান্য স্থানে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে আসা জনগণের ওপর বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ হতে থাকে।

হয়তো দুঃখজনকভাবে অজ্ঞানতার কারণে অথবা চারিদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লাগাতার হয়ে চলা প্রচার, যা প্রধানত রাষ্ট্রীয় বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চালানো হচ্ছিল, তার ফলে এই ইস্যুতে যে প্রভাবশালী মতামত গড়ে ওঠে তাতে তিনটি স্পষ্ট মতামত বেরিয়ে এসেছে।

প্রথমত পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ থেকে অবাধে মুসলমান কৃষকদের বেআইনিভাবে আসামে অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশের লাগোয়া জেলাগুলোতে জনসংখ্যাগত অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং ফলে কতকগুলো লাগোয়া জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন।

দ্বিতীয়ত এই বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা জোরজার করে স্থানীয় জনগণের দখলে থাকা জমিজমাগুলোতে ঢুকে পড়ছে ও জমিগুলো কব্জা করে নিচ্ছে। তার ফলে সেখানে একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যাতে বেআইনি অনুপ্রবেশকারিরা এবং স্থানীয় মানুষদের মধ্যে যখন তখন ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটে যাওয়া সম্ভব।

তৃতীয়ত, স্থানীয় বোড়ো সম্প্রদায় (‘হিন্দু’ বোড়ো, যেমনটা ঐ সম্প্রদায় থেকে আসা নির্বাচন কমিশনার শ্রী এইচ এস ব্রহ্ম জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন) এবং কোকরাঝাড়ে বসতি স্থাপনকারি বেআইনি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে জাতি দাঙ্গা শুরু হয়েছিল পরবর্তীতে তাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাগত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বোড়োদের ওপর দখলদারি ও আক্রমণ হানার ফলে, অথবা অনুপ্রবেশকারীদের তরফ থেকে ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও স্থানীয়দের জমি ও সম্পদ জবরদখল করে নেওয়ার বিরুদ্ধে বোড়োদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে।

উপরোক্ত উপলব্ধিসমূহ যাই হোক সঠিক নয়। কারণ বুঝতে হলে—কিভাবে তাদের উদ্ভব হল, ধারণাবলীর অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো এবং প্রকৃত বাস্তবতা কি? এসব সতর্কতার সাথে পুনর্মূল্যায়ন করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ঃ
‘‘অভিগমন’’, না ‘‘বেআইনি অভিবাসন’’

পূর্ববাংলা থেকে আসামে বাঙালি মুসলমানদের অভিগমনের ফলে নিশ্চিতভাবেই আসামের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন হয়েছে, লক্ষ্যণীয়ভাবে কয়েকটি জেলায়। কিন্তু তা ঘটেছে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশের ফলে—এই দাবি ঐতিহাসিকভাবে বেঠিক শুধু তাই নয়, তা হল ইচ্ছাকৃতভাবে বাস্তব ঘটনার বিকৃতি সাধন।

ব্যাপক ও ধারাবাহিক অনুপ্রবেশের ফলে আসামের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন হয়েছে, এই দাবি করা হয় সাধারণত ভারতের জনগণনা তথ্য অনুযায়ী। ১৯৫১ সাল থেকে দশকের পর দশক ধরে আসামের জনসংখ্যার যে উচ্চহারে বৃদ্ধি ঘটেছে তা প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরে।

যদি আমরা আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির দশক ভিত্তিক হারকে অনুরূপ ভারতীয় হারের সঙ্গে তুলনা করি, বিশেষত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ১৮০০ শতকের শেষ দিক থেকে দেশভাগের পূর্ববর্তী দশকগুলোতে পূর্ববঙ্গ থেকে বাঙালী মুসলমান কৃষকদের ব্যাপকহারে অভিগমনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখি, তাহলে মনে হবে যে এই ধরনের অনুপ্রবেশ অবশ্যই মারাত্মকভাবে চলে আসছে, আর এখন তা বেআইনি অভিবাসন।

যদি বাংলাদেশের সীমানা লাগোয়া আসামের ধুবড়ি জেলা—যেখানে আসামের ২৭টি জেলার মধ্যে সর্বাধিক শতাংশ, ৭৪.২৯ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা—তাকে এই তুলনার মধ্যে ধরা হয় তা হলে মনে হবে তাহল বেআইনি অনুপ্রবেশের স্বপক্ষে সর্বাধিক নিশ্চিত প্রমাণ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সামগ্রিকভাবে আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে অনেক বেশি।

কিন্তু দশক ভিত্তিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ও তাদের তুলনা সংক্রান্ত উপরোক্ত সংখ্যাতত্ত্ব কি আসামে বেআইনি অনুপ্রবেশের প্রকৃতই অকাট্য প্রমাণ?

এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে ১৯৭১ থেকে আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে এবং তা সর্বভারতীয় হারের থেকে কম, যা নির্দিষ্টভাবে এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ এখনো চলে আসছে। ১৯৮৫ সালের আসাম চুক্তি অনুযায়ী ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর যারা আসামে এসেছে তারাই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বলে গণ্য হবে। তাহলে এই লক্ষণটিই কি যথেষ্ট নয় যে অধিকাংশ অনুপ্রবেশ ঘটেছে ১৯৭১-এর আগে এবং তাকে বেআইনি অনুপ্রবেশ বিবেচনা করা যাবে না?

আমরা যদি আসামের অন্য দুটি জেলা ধেমাজি এবং কার্বি আংলঙ-এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দশক ভিত্তিক হারের দিকে লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাব যে সেখানকার বৃদ্ধির হার আসামের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি এবং মুসলমানগরিষ্ঠ সীমান্ত জেলা ধুবরির চেয়েও যথেষ্ট পরিমাণ বেশি। তবুও ধেমাজি এবং কার্বি আংলঙ-এর মুসলমান জনসংখ্যা অতি সামান্য। এই দুই জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা যথাক্রমে ৯৫.৯৪ শতাংশ এবং ৮২.৩৯ শতাংশ। তপশিলী উপজাতি ৪৭.২৯ শতাংশ এবং ৫৫.৬৯ শতাংশ। সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা যথাক্রমে ১.৮৪ শতাংশ এবং ২.২২ শতাংশ। যদিও সেখানে দশক ভিত্তিক বৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে খুবই উঁচু। ১৯৬১-৭১-এ ধেমাজিতে ১০৩.৪২ শতাংশ এবং কার্বি আংলঙ-এ ১৯৫১-৬১-তে একইরকম উঁচু ৭৯.২১ শতাংশ। এটা যথেষ্ট প্রমাণ যে বেআইনি অনুপ্রবেশ অথবা মুসলমান জনসংখ্যার বিষয়টি ছাড়াও দশক ভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারের পেছনে অন্য কোন কারণ আছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো নির্দিষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে পছন্দমাফিক জনগণনা তথ্য তুলে ধরে ‘‘অস্বাভাবিক উচ্চ’’ জনসংখ্যার দশক ভিত্তিক হার দেখানোটা বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ হতে পারে না। এছাড়াও, বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মাত্র তিনটি জেলা সমন্বিত আসামের বিপরীতে অনুরূপ ৫টি জেলা সমন্বিত মেঘালয়ের দশক ভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঐ জেলাগুলোতে অধিকতর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মুসলমান জনসংখ্যা অতি সামান্য হওয়ায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারিদের দ্বারা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন সন্দেহকে নস্যাৎ করে দেয়। এই ঘটনা কেবলমাত্র বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী হওয়ার জন্যই কোন জেলা বেআইনি অনুপ্রবেশ কবলিত হবে এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। (ক্রমশ)

কুড়ানকুলাম সংগ্রাম ঃ তামিলনাড়ু বিধানসভা অভিযানে সি পি আই (এম এল) কর্মীরা গ্রেপ্তার

চেন্নাইয়ে কুড়ানকুলাম-বিরোধী ইস্যুতে গত ২৯ অক্টোবর তামিলনাড়ু বিধানসভা অভিযান থেকে পুলিশ ২৫০ জনেরও বেশী সি পি আই (এম এল), এ আই এস এ, আর ওয়াই এ এবং সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। কুড়ানকুলাম পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বিরোধী অহিংস সংগ্রামের ৪৪৬ তম দিবসে, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনগুলি প্রতিবাদ কর্মসূচী সংগঠিত করেছিল। এই প্রতিবাদী কর্মসূচীতে দাবি তোলা হয়, এ আই এ ডি এম কে সরকারকে কুড়ানকুলাম পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাশ করতে হবে, আন্দোলনকারিদের ওপর চাপানো সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, ১৪৪ ধারা তুলে নিতে হবে এবং ইদিন্তাকরাই, কুড়ানকুলাম এবং ভৈরভিকিনরু এলাকা থেকে পুলিশ বাহিনীকে প্রত্যাহার করতে হবে।

বেপরোয়া এ আই এ ডি এম কে সরকার বিধানসভা অভিযানের দিন শহরে হাজার হাজার পুলিশ নিয়োগ করেছিল। ৮০০০-এরও বেশী পুলিশ বিধানসভা ভবন ও সচিবালয়ের সামনে অবরোধ খাড়া করেছিল। প্রত্যেকটি রেল স্টেশনে ও বাস স্ট্যান্ডে লাঠিধারী পুলিশ ব্যাটেলিয়ন মোতায়েন করা হয়েছিল। পুলিশ কার্যত শহর দখল করে নিয়েছিল। সমস্ত যানবাহনকে শহরের বাইরে আটকে দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীবাহিনীকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন থানায় আটকে রাখা হয়েছিল। সি পি আই (এম এল)-এর তিরুভেলোর জেলা সম্পাদক ও সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির রাজ্য সম্পাদক কমরেড জানকীরামনকে ঐদিন সাতসকালেই বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বহু মানুষকেই বিধানসভা অভিযানে সামিল হওয়ার পথে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই অভিযানে বিহার ও অন্যান্য জায়গার পরিযায়ী শ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করেন।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য সম্পাদক কমরেড বালসুন্দরম, এ আই এস এ, আর ওয়াই এ, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি এবং এ আই সি সি টি ইউ-র নেতৃবৃন্দ। অভিযান কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমরেড বালসুন্দরম তামিলনাড়ুর স্বৈরাচারি এ আই এ ডি এম কে সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানান কুড়ানকুলাম-বিরোধী সংগ্রামের ওপর দমন-পীড়ন নামিয়ে নিয়ে আসার প্রতিবাদে। তিনি আরও বলেন, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী কুড়ানকুলাম-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এক ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করতে জনবিরোধী মনমোহন সিং সরকারের সাথে আঁতাতবদ্ধ হয়েছেন। কমরেড বালসুন্দরম এর বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ থেকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়ার আহ্বান রেখেছেন।

বিধানসভা অভিযানের দিন ৪০০০-এর বেশী প্রতিবাদী জনতাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে ৬টি আলাদা আলাদা জায়গায় আটকে রাখা হয়েছিল। ঐদিন সন্ধ্যায় পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। ভি সি কে, এম ডি এম কে, পি এম কে, টি ভি কে, টি এম এম কে, এস ডি পি আই, এন এ পি এম সহ আরও বহু সামাজিক সংগঠন বিশাল সংখ্যায় ঐ কর্মসূচীতে সামিল হয়েছিলেন।

ঐদিনই এস পি উদয়কুমারের নেতৃত্বে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে প্রতিবাদ সংগঠিত হয়।

বিধানসভা অভিযানের ওপর পুলিশী বর্বরতা চালানোকে ধিক্কার জানাতে সি পি আই (এম এল) গত ৩০ অক্টোবর রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করে।

পুলিশী সন্ত্রাসের নয়া নজির গেন্দাপাড়ায়

জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের গেন্দাপাড়া চা বাগানের ২ জন শ্রমিক গত ২৫ অক্টোবর বুনো মহিষের হামলায় নিহত হন। বাটুলী বানিয়া (বয়স ৬১) এবং সোহন ইন্দওয়ার (বয়স ৪৫) নামে এই ২ জন শ্রমিককে চোখের সামনে মরতে দেখে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হন। পুলিশ এবং বন দপ্তরের নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তোলে, জনতা বনদপ্তরের দুটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং ৪ জন কর্মীকে মারধর করে। এরপরেই নেমে আসে ভয়াবহ পুলিশী নিপীড়ন। এই প্রেক্ষাপটে এ আই এস এ-র এক প্রতিনিধি দল কমরেড প্রহ্লাদ বিশ্বকর্মার নেতৃত্বে গেন্দাপাড়া পরিদর্শন করেন। ৪ সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলের সামনে মানুষ তাদের ক্ষোভ উগরে দেয় পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তারা জানায় পুলিশ প্রত্যেকদিন রাতে এসে নির্বিচারে গ্রেপ্তার করছে এবং ৪ জন সাধারণ যুবক শম্ভু ভাণ্ডারী, ধীরেন মাহালী, দুর্গা গুরুঙ, কালী খড়কাকে বিনা দোষে আটক করেছে। অলোক নেওপানি এবং অভিষেক নেওপানি নামে দুজনের ঘর পুলিশ

সাতের পাতায় দেখুন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশ্ববিশ্রুত মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম

এরিক হবসবম (৯ জুন ১৯১৭-১ অক্টোবর ২০১২) বিশ শতকের অন্যতম খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ হিসেবে গোটা দুনিয়ার সব মহলেই নন্দিত ছিলেন। এমনকি যারা মার্কসবাদের সমর্থক নন, তাঁরাও এই আনখশির মার্কসবাদী ইতিহাসবিদের অসামান্য অবদানকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। হবসবম জন্মেছিলেন রুশ বিপ্লবের বছরে, ১৯১৭ সালে। তাঁর পরিবার তখন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে। হবসবমের জন্মের দু বছর পর তাঁরা প্রথমে চলে আসেন জার্মানীর ভিয়েনায়, অতঃপর বার্লিনে। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর হবসবম চলে আসেন ইংলণ্ডে এবং বাকী জীবন সেখানেই থাকেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি এইচ ডি করেন, গবেষণার বিষয় ছিল ফেবিয়ান সমাজ। সারা জীবন ইতিহাসের অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী। ১৯৩৬ সালে তিনি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং ১৯৯১ সালে পার্টি বিলুপ্তির আগে পর্যন্ত তিনি এর সভ্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত আগ্রাসনের পর তাঁর বেশিরভাগ সহযোগী বন্ধু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করলেও তিনি পার্টির সাথেই যুক্ত থাকেন। পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়ার স্খলনগুলো নিয়েও তিনি সে সময় সোচ্চার হন। হাঙ্গেরী এবং পোলাণ্ড-এর বিদ্রোহকে সমর্থন করে তিনি একে বলেছিলেন, 'আমলাতন্ত্র ও ছদ্ম কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের বিক্ষোভ'। কমিউনিস্ট মতাদর্শে অবিচল থেকেও তার ভুল কোন প্রয়োগের সম্পর্কে আপসহীন সমালোচনা আমরা কিছুদিন আগেও তাঁর থেকে পেয়েছি আমাদের রাজ্যের প্রসঙ্গে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতি, কৃষক হত্যার মত ঘটনা যে তাদের প্রবলভাবে জনবিচ্ছিন্ন করবে—বামেদের শুভাকাঙ্খী হয়েও একথা বলতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। মতাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই যে কোন ভুল প্রয়োগের তীক্ষ্ণ সমালোচনার প্রয়োজন রাখে, হবসবম তাঁর উদাহরণ হিসেবে আমাদের সামনে থাকবেন।

প্রি ক্যাপিটালিস্ট ইকনমিক ফর্মেশন, ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড এম্পায়ার, রিভোলিউশনারিস, নেশনস অ্যাণ্ড ন্যাশানিলজম, অন হিস্ট্রি বা সাম্প্রতিকালে লেখা ইন্টাররেস্টিং টাইমস ঃ এ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী লাইফ, গ্লোবালাইজেশন, ডেমোক্রেসি অ্যাণ্ড টেররিজম, হাউ টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড-এর মতো বহু সাড়া জাগানো বইয়ের লেখক হলেও হবসবম সারা বিশ্বের মননশীল পাঠকের কাছে বিখ্যাত হয়ে আছেন চার পর্ব জুড়ে বিশ্লেষিত ইউরোপ তথা বিশ্বের আধুনিকতার ইতিহাসের অনবদ্য আখ্যানের জন্য।

এজ অব রিভোলিউশন (১৭৮৯-১৮৪৮), এজ অব ক্যাপিটাল (১৮৪৮-১৮৭৫), এজ অব এম্পায়ার (১৮৭৫-১৯১৪), এজ অব এক্সট্রিমস (১৯১৪-১৯৯১) সম্মিলিতভাবে আধুনিক সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্য হিসেবেই পরিগণিত হয়।

এজ অব রিভোলিউশন ফরাসী বিপ্লব ও ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সূত্র ধরে আধুনিক ইউরোপের বহুস্তরিক নির্মাণপর্বের শুরুর দিনগুলোর অসামান্য ভাষ্য। আমরা স্মরণ করতে পারি বইয়ের প্রথম চমকপ্রদ বাক্যটি। 'প্রথমেই নজরে পড়ে ১৭৮০-র দশকের পৃথিবী আমাদের আজকের পৃথিবীর তুলনায় একইসঙ্গে ছিল অনেক ছোট এবং অনেক বড়'। অতঃপর হবসবম আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে দেখান ভৌগলিক সীমা সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রেক্ষিতেই হোক বা লোকসংখ্যার নিরীখে, কেমন ছোট ছিল সে সময়ের পৃথিবী। আবার যোগাযোগ ব্যবস্থার তখনকার অপ্রতুল অবস্থা এই ছোট পৃথিবীকেই আজকের তুলনায় বড় করে দেখাত। হবসবম দেখিয়েছেন শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে ইউরোপ তথা পৃথিবী কীভাবে নতুন নতুন ভৌগলিক ভূখণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে ক্রমশ পরিচিত হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে ধারণাগত আঞ্চলিক সীমা, আবার যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব বিকাশ কীভাবে দূরকে করে তুলছে নিকট। শিল্প বিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, বিশ্বজোড়া তার তাৎপর্য, যা আগামী দিনগুলোকে সারা বিশ্বের জন্যই বদলে দেবে, তাঁর অসামান্য ভাষ্য রচনার পর হবসবম মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের উত্থানের ইতিহাস আলোচনা করেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতির অসামান্য বিকাশের পাশাপাশি গরিব শ্রমজীবী মানুষের একটি শ্রেণী হিসেবে কীভাবে তৈরী হয়ে উঠেছে সে কথাও তোলেন হবসবম।

এজ অব ক্যাপিটাল বইটি ইউরোপীয় পুঁজিবাদের দুর্মর বিকাশ ও বিশ্বজোড়া তার প্রভাবের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে বারবার এসেছেন মার্কস, এসেছে তাঁর ক্যাপিটাল ও অন্যান্য বইয়ের প্রসঙ্গ। হবসবম আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন মার্কস এবং এঙ্গেলস যেমন বলেছিলেন, 'ইউরোপ একটা ভূত দেখছে, কমিউনিজমের ভূত', তেমনি অন্য অনেকেও কেমন এরকমটাই বলছিলেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে। ১৮৪৮-এ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখার বছরেই ফরাসী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিশিষ্ট রাজনীতিক আলেক্সি দ্য তকুইভিল সবার মনের ভাব প্রকাশ করছিলেন, 'আমরা কি একটা আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে নেই? আমরা কি বুঝতে পারছি না জগৎটা কাঁপছে? বিপ্লবের হাওয়া বইছে, দিগন্তে দেখা যাচ্ছে ঝড়'। পুঁজিবাদের বিকাশের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ ও প্রতিস্পর্ধিতার গৌরবময় নানা প্রচেষ্টা, দ্বন্দ্বের ঝোড়ো হাওয়ার ইতিহাস এই বইটিতে হবসবম তুলে আনেন।

এজ অব এম্পায়ার বইটি শুরু হয় ১৮৫৭-র অর্থনৈতিক মন্দার পর্বটি দিয়ে। ইউরোপীয় পুঁজিবাদ দ্রুতই এই মন্দার দশা কাটিয়ে ওঠে, কিন্তু এই সময়েই আমেরিকান ও জার্মান অর্থনীতি ব্রিটিশ অর্থনীতিকে টেক্কা দিতে থাকে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ পণ্য চলাচলকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়, বাড়তে থাকে জীবনযাত্রার মান। অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং দেশগুলোর ভেতর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অসাম্য পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর উপনিবেশ বাড়ানোর চেষ্টা। আপাত শান্তির পরিবেশে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়ে যেতে থাকে। সময়ের মধ্যে নিহিত এইসব মৌলিক দ্বন্দ্ব শেষপর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো এক তীব্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। লেনিনের মত অনেকেই মনে করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। হবসবম স্বীকার করেন পুঁজিবাদ নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। তবে তা পারলেও অষ্টাদশ শতকের শেষে শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের উত্তরাধিকারজাত যে চরিত্র নিয়ে সে পথ চলা শুরু করেছিল তার সে চরিত্র বহুলাংশে বদলে গেছে। অনেক সমাজতান্ত্রিক দাবিকে নিজের মধ্যে অঙ্গীভূত করে 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র' নামক এক ব্যবস্থার জন্ম দিতে সে বাধ্য হয়েছে।

এজ অব এক্সট্রিমস প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের সময়কাল থেকে ১৯৯১-এ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবসানপর্ব পর্যন্ত সময়ের দলিল। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের দ্বন্দ্বের বিশ্বজনীন চেহারা ছাড়াও উপনিবেশগুলোতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে সমাজতন্ত্র, তার নির্মাণ, বিকাশ, জটিলতা, পুঁজিবাদের সাথে তার দ্বন্দ্ব ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন নিশ্চিতভাবেই এই বইয়ের মূল মেরুদণ্ড। হবসবম মনে করেছেন রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র শুরু থেকেই সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মৌলিক কিছু মতাদর্শের সাথে সংঘাতে উপনীত হয়। সমাজতন্ত্রের মধ্যে নিহিত গণতন্ত্রের প্রশ্নটিকে অনেক সময়েই অবহেলিত থাকতে হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া বা চীনের মত অনেক দেশের বিপ্লব শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত পরামর্শের চেয়ে ভিন্ন পথে হেঁটেই অর্জিত হয়েছে। যেমন স্ট্যালিন নির্দেশিত পন্থাকে অতিক্রম করে মাও নিজের দেশকালের অনুগ নিজস্ব পথ তৈরী করেছিলেন। কমিউনিস্টদের নিজস্ব কার্যক্রম সীমিত রেখে ফ্যাসিবিরোধী মঞ্চেই সব প্রয়াস উন্মুক্ত করার কমিন্টার্ণপ্রেরিত নির্দেশিকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউন্টি আন্দোলনে অনেক সময়েই ভালো ফল দেয়নি। একুশ শতকের এই সময়ে আমরা যখন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইকে নতুন চেহারায় নতুন প্রেক্ষিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবি, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মতাদর্শকে শাণিত করতে চাই, তখন হবসবম এর তোলা বিতর্কগুলো আমাদের চিন্তাকে বহুলাংশে সমৃদ্ধ করে। বিশ্ব রাজনীতি তথা পুঁজিবাদ-সমাজবাদের বিকাশ ও দ্বন্দ্বের যে বহুমাত্রিক ইতিহাসে বিপ্লবী কর্মীদের জারিত, অভিজ্ঞ হওয়া একান্ত প্রয়োজন—তার অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার হিসেবে এরিক হবসবম স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

- সৌভিক ঘোষাল

সীমান্ত দিয়ে অবৈধ গরু পাচারে দেশী-বিদেশী কালো টাকার পুঁজি ও সামাজিক অবক্ষয়, নিরাপত্তাহীনতা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ, গোপালনগর, গাইঘাটা এলাকায় বেআইনি গরু পাচারের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ, রেল অবরোধ, থানার সামনে বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে।

এই বিষয়টা নিয়ে যদি একটু গভীরে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে দেশের কৃষি সংকট এর পিছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রথম সবুজ বিপ্লবের থেকে শুরু করে টানা এই দশক পর্যন্ত কৃষিতে ক্রমাগত কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। কৃষিতে পুরানো উৎপাদন ব্যবস্থার জায়গায় ঢুকে স্থান নিয়েছে আধুনিক উপকরণ। লাঙ্গল বলদ দিয়ে চাষের স্থান নিয়েছে ট্রাক্টর, ফসল মাড়াই, বহন ইত্যাদিতে বলদের পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি, গোবর থেকে জৈব সারের স্থান নিয়েছে রাসায়নিক সার। চাষের কাজে গবাদি পশুর ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক গো মাংসের বাজারের জন্য বেআইনি গরু বেড়ে গেছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশের বেআইনি গরু ব্যবসাদারদের সাথে গাটছড়া বেঁধে এদেশের গরু পাচারকারিরা চড়াদামে কারবার চালাচ্ছে। এই অবৈধ গরু পাচার রোধের দাবিতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়, প্রতিবাদ জানাতে একাধিকবার ট্রেন অবরোধ করা হয়। কিন্তু জেলা শাসকের বক্তব্য হল, জাতীয় স্তরের প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা থেকে শুরু করে বি এস এফ পর্যন্ত এই কারবারে যুক্ত। কাউকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা জেলা শাসক হিসেবে তাঁর নেই। প্রতিবাদ করলে পাচারকারীদের হাতে জোটে প্রচণ্ড মারধোর। গ্রামের কৃষকদের ওপর তাদের শাসন কায়েম করার আগেই গ্রামের পঞ্চায়েত, ডাকা-বুকো মস্তান, সম্ভব হলে ক্লাবগুলোকে হস্তগত করার জন্য ভালো অঙ্কের টাকা তাদের দিচ্ছে। কোথাও কোথাও পাচারকারীদের নিয়ে সিণ্ডিকেট তৈরী হয়েছে। বেকার বাউণ্ডুলে যুবক, মদখোর, গাঁজাখোর, জুয়াড়ি—এরাই ভিড়েছে সিণ্ডিকেটে। এদের কাজ তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় পাচার কাজে বাধা-বিঘ্নকে রোধ করা। গরুর বাথান পাহারা এবং গরু হাঁটা পথে যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশ গ্রামীণ কৃষিমজুর গরিব কৃষক ঘরের যুবক। কাজ না পাওয়ার অভাবে এর টানে দূর দূর গ্রামীণ গরিবরা বাধ্য হয়ে এ কাজে যুক্ত হচ্ছে। এমন কি স্কুলপড়ুয়া ছাত্রও গরু পাচারে যুক্ত হয়ে পড়ছে। পাচারকারী পাণ্ডাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র-বোমা থাকে। সবমিলিয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মানুষ এক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। থানার পুলিশ বাধ্য হয়ে মাঝেমধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গরু সহ গাড়ি ধরে কেস দেয়। গরুগুলো সীমান্তের বি এস এফের হেপাজতে জমা পড়ে। বি এস এফ সেই গরুগুলো অকসান ডেকে বিক্রি করে। ক্রেতা হিসাবে সেই গরু পাচারকারীরাই থাকে। তারপর বি এস এফের সাথে সাটঘাট বেধে সীমান্ত পার করে দেয়।

রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। সীমান্ত এলাকায় মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষা, প্রশাসনের দুর্নীতি-অপদার্থতার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ যেমন বাড়ছে তেমনি সরকারের কাছে দাবি উঠছে—(ক) চোরা পথে গরু পাচার বন্ধ করতে হবে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় ঈশ্বরগুপ্ত সেতু ও বালী ব্রীজে পাচারের গাড়ি আটক করতে হবে। (খ) গরু পাচারকারিদের শাস্তি ও জনতার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। **- কৃষ্ণ প্রামাণিক**

স্মরণ সভা

প্রয়াত কমরেড সুরজিৎ অধিকারীকে মনে রেখে ...

১০ অক্টোবর ২০১২ অসময়ে চলে গেছিলেন কমরেড সুরজিৎ অধিকারী। যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষটি সময়ের সঙ্গে সমঝোতায় হার মেনেছেন। অথচ ভালবাসা ছড়িয়েছেন, ভালবাসা পেয়েছেন অবাধ, অগাধ, তারই ছবি ফুটে উঠল সুরজিৎ-এর স্মরণসভায়। গত ২ নভেম্বর শিলিগুড়ি শহরের রামকিঙ্কর বেজ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পার্টির আহ্বানে তাঁর স্মরণসভা। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বহু মানুষ ও পার্টি কর্মীদের ঠাসা ভিড়ে এই স্মরণসভায় বহু মানুষ সুরজিৎ-এর এই অসময়ে চলে যাওয়াতে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে তাঁর বহুমুখী গুণের কথা ব্যক্ত করেছেন। সভার শুরুতে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্টি নেতা, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বহু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ স্তবক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। সভার শুরুতে সুরজিৎ-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রণজিৎ মুখার্জী ও পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের মীরা চতুর্বেদী তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য কমিটি সদস্য বাসুদেব বসু, দার্জিলিং জেলার নেতা পুলক গাঙ্গুলী, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা অভিরঞ্জন ভাদুড়ী, দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সাথী শতদল গুপ্ত, টুলটুল, রূপক মুখার্জী, সি পি আই (এম এল)-এর প্রদীপ দেবনাথ, রতন দে, গৌর বৈদ্য ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী পার্থ চৌধুরী, পলক চক্রবর্তী, মলয় ঘোষ, অঘোর ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, অধ্যাপক অজিত রায়, ডাঃ অতনু রায়, প্রদীপ সরকার, বিমান দাসগুপ্ত, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, নেপালী ভাষার কবি রাজা পুনিয়ানী, সমাজসেবী দেবাশীষ চক্রবর্তী, ছাত্র নেতা প্রদীপন গাঙ্গুলী, সুরজিৎ পাল, সুরজিৎ-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুব্রত অধিকারী। সভার শেষে সুরজিৎ-এর একমাত্র কন্যা সংহতি-র স্মৃতিচারণ ও গান সবার চোখে জল এনে দেয়। এই অশ্রুসজল স্মরণসভা পরিচালনা করেন পার্টির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার।

নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে পেনশন রাজ্য সরকারের বিমুখতার শিকার হচ্ছে কেন?

নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন সংস্থা থেকে প্রায় ২৭০০ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা বর্তমানে দুর্বিসহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। সংবাদজগতেল এই তথ্য ইতিমধ্যে বহু প্রচারিত হয়েছে। তাই নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশন শিলিগুড়ি ডিভিশনের পক্ষ থেকে দু-চারটি কথা তুলে ধরতে চাই।

পরিবহন শিল্পের অবসরপ্রাপ্ত, অসহায়, অর্ধাহারে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় জর্জরিত বৃদ্ধ মানুষজন বিগত বাম সরকারের আমলে পেনশন নীতির কিছুটা ত্রুটি থাকলেও প্রায় নিয়মিত পূর্ণ পেনশন পেতেন। তার ফলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা কোনরকমে সংসার চালানো, বৃদ্ধ বয়সে চিকিৎসা ইত্যাদি করতে পারতেন।

গত ২০০০ সালের ২৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার দি ক্যালকাটা গেজেট এক্সট্রাঅর্ডিনারি নোটিফিকেশন নাম্বার্স ৩২৬/এন বি এস টি সি/সি ও বি/২০০০-০১ এবং ৩২৭/এন বি এস টি সি/সি বি ও/২০০০-০১-এর মাধ্যমে আমাদের পেনশন স্কীম বিধিবদ্ধ করেছিল। উক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি পত্র অনুযায়ী পেনশন চালু হয়েছিল।

প্রসঙ্গত একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় নজরে আনা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেটা হল, রাজ্যপালের আদেশনামা ৪০৯৪ ডব্লিউ টি/১১বি-১৪/২০০৭, তারিখ কলকাতা, দি ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ এবং অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট স্বাক্ষরিত নোটিফিকেশনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারীদের সমতুল পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীরাও সমান অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত পঞ্চম বেতন কমিশনও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় পরিবর্তিত হারে পেনশন সুপারিশ করে। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশ অনুযায়ী আমাদের ক্ষেত্রে বেতন কমিশনের সুপারিশ মত পেনশন চালু হয়।

কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত সরকার পরিবহন শিল্পে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশনের পরিবর্তন এনে বৃদ্ধ পেনশনার্সদের কার্যত মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশন নীতির বিরুদ্ধে সরব, কিন্তু অন্যদিকে তারই রাজ্যে পরিবহন শিল্পে গত নভেম্বর ২০১১ থেকে জুলাই ২০১২ পর্যন্ত তিনমাস পরপর মাত্র ৫০ শতাংশ পেনশন প্রদান করেছে। আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর তিন মাস পার হয়ে গেল, অথচ পেনশন প্রদান করা হল না। এই সময়টা উৎসব-পরব-পার্বনের সময়, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের কি উৎসবে আনন্দ উপভোগ করার অধিকার নেই?

অন্যদিকে লিভ সেলারী, গ্র্যাচুইটি, কমোটেশন ভ্যালু, পঞ্চম বেতন কমিশনের ছয় মাসের বকেয়া অর্থ, উৎসব ভাতা এবং ডি এ সহ সমস্ত পাওনা বন্ধ। এটা কি দ্বিচারিতা নয়?

ইতিমধ্যে দলমত নির্বিশেষে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা তাদের ন্যায্য পাওনার দাবিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বারবার সংস্থার কর্তৃপক্ষের কাছে তথা শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি দেওয়া সত্ত্বেও অসহায় পেনশনার্সদের কোন সুরাহা হয়নি। তাই পেনশনার্স সংগঠন আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি বৃদ্ধ বয়সে নিয়মিত পূর্ণ পেনশনের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁরা পুলিশের খাতায় নামও লিখিয়েছেন। এই পরিস্থিতি তৈরী হওয়াটাই কি পরিবর্তন? নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণকে জানানোর জন্য কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

পেনশনার্স সংগঠন আবেদন রাখছে, বর্তমান রাজ্য সরকারকে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত পেনশন ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে। অন্যথায় অনাহারে, অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায় থাকা অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পুনরায় বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে।

পরিবহন শ্রমিকদের
শিলিগুড়ি ডিভিশনের পক্ষে
স্বপন কুমার দে (সভাপতি)
অনন্ত দে সরকার (ডিপো সম্পাদক)
অমর কান্তি সেনগুপ্ত (সহ-সম্পাদক)

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন
নবম পার্টি কংগ্রেসের শ্লোগান

১। রাজনীতি আর বৃহৎ পুঁজির অশুভ আঁতাত ধ্বংস করুন, শক্তিশালী করে তুলুন জনগণের রাজনীতিকে!

২। আমেরিকা ও বৃহৎ কর্পোরেট ঘরানার স্বার্থবাহী নীতিসমূহ প্রত্যাখ্যান করুন, দেশ ও জনগণের কল্যাণকর নীতির জন্য সংগ্রাম করুন!

৩। কর্পোরেট লুণ্ঠন থেকে প্রকৃতি ও তার সম্পদকে রক্ষা করুন, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুন!

৪। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং গণতন্ত্রের ওপর কর্পোরেট কব্জা প্রতিহত করুন—দেশকে বাঁচান, মানুষের অধিকার উর্ধ্বে তুলে ধরুন!

৫। জমি, জীবিকা ও স্বাধীনতার ওপর আক্রমণের মোকাবিলা করুন—গণতন্ত্র ও মানুষের মর্যাদা রক্ষা করুন!

৬। সামন্ততান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক হামলা প্রতিহত করুন—মহিলা ও দলিতদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করুন!

৭। সাম্প্রদায়িক হিংসা এবং সন্ত্রাস মোকাবিলার নামে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন প্রতিহত করুন—সাম্প্রদায়িক নরঘাতকদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হোন!

৮। অপারেশন গ্রীণ হান্টের নামে আদিবাসীদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন! আদিবাসীদের জমি, জঙ্গল ও আত্মপরিচয়ের অধিকার উর্ধ্বে তুলে ধরুন!

৯। জনগণের আন্দোলন তীব্রতর করতে সি পি আই (এম এল)-কে শক্তিশালী করুন, সংগ্রামী বাম বিকল্প গড়তে গণসংগ্রামের শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন!

১০। কংগ্রেস ও বিজেপি-র বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তুলুন! সি পি আই (এম এল)-এর আসন্ন নবম কংগ্রেস সফল করুন! রাঁচী, ২-৬ এপ্রিল ২০১৩

জনবহুল পাড়ায় মদের দোকানের বিরুদ্ধে সোচ্চার নাগরিক উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি শহরে জনবহুল জয়ন্তী পাড়ার মধ্যে মদের দোকান খোলাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং জোরালো আন্দোলন গড়ে উঠতে চলেছে। এপ্রিল মাসে এই বিষয়ে ''দেশব্রতী'' পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হয়। উক্ত কারবারী ছয় মাসের জন্য মদের দোকানের লাইসেন্স পায়। সে এফ এল শপ নং সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিব্যি মদ বিক্রী করে চলেছে আর লোকজন রাস্তায় দাঁড়িয়েও মদ পান করে চলেছে। এর প্রতিবাদে ১২ নং ওয়ার্ডের এবং আশেপাশের মানুষ সংগঠিত হয়ে এই মাসের প্রথম দিকে পাড়ার মাঠে এক জনসভার আয়োজন করে। প্রায় ৪০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের প্রদীপ গোস্বামী। মদের দোকান মালিক পুলিশকে ব্যবহার করে। পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদে সভার শেষে রাতেই প্রায় ৩০০ জন মানুষ মিছিল করে থানায় আই সি-র কাছে গিয়ে জোরালো প্রতিবাদ করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিলেন মহিলা। মদের দোকানের কাছেই রয়েছে কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এবং তৃণমূলের কাউন্সিলের অফিস। এরা দুজনেই নিশ্চুপ। জনসাধারণ বলছেন এরা মোটা টাকা খেয়ে বসে আছেন। যে কারবার এর আগে সি পি এম ভালোভাবেই করে গেছে। এদিকে সুপারিনটেণ্ডেন্ট অফ বেঙ্গল এক্সাইজ বলেছেন, লোকজনের সম্মতি না থাকলেও এমনকি যে টাকা দেবে তাকেই লাইসেন্স দেওয়া যাবে। এরফলে পাড়ায় বসবাসের পক্ষে যে বিষাক্ত এবং অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কিছু কর্মসূচী কার্যকরি করা হয়েছে, যা একাধিকবার সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। পূর্বতন সরকার এবং বর্তমান সরকারের এইরূপ ঢালাও মদ ব্যবসা চলতে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে পল্লীর মানুষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্য সংগঠিত হতে চলেছে।

৯ অক্টোবর বাবুপাড়া সুভাষভবনে এক কনভেনশন সংগঠিত হয় জয়ন্তী পাড়া নাগরিক কমিটির উদ্যোগে। এই কনভেনশনে বেশ কিছু সামাজিক ও গণসংগঠন অংশ গ্রহণ করে। আর ওয়াই এ-র পক্ষ থেকে মুকুল চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন। নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে কনভেনশনের প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন প্রদীপ গোস্বামী। এই কনভেনশন থেকে আগামীদিনের আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ১৪০ টাকা

পুলিশী সন্ত্রাসের ...

ছয়ের পাতার পর

ভাঙচুর করে। পুলিশের ভয়ে গেন্দাপাড়া বড়ালাইন-এর যুবকেরা রাতে ঘর ছেড়ে চা বাগানে আশ্রয় নিচ্ছে। বুনো মহিষের হামলায় আহত চা শ্রমিক বুধুয়া রিখিয়াসিম উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি। তাঁর সাথে দেখা করে এ আই এস এ-র প্রতিনিধিদল। আহত আরেকজন জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বাটুলি বানিয়ার স্বামী জানান বনদপ্তর তাদের ২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। এ আই এস এ দাবি জানায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং অবিলম্বে পুলিশী সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে, সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রয়াত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুবর্ষ ভুলবশতঃ ছাপা হয়েছে '১৯৯৪'। এর জন্য আমরা দুঃখিত। তিনি প্রয়াত হলেন ২০১২-য়।

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹-২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com